ভাঙো দুর্দশার চক্র

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের দুর্দমনীয় ইতিবাচকতা ও আশাবাদী জীবনদৃষ্টির স্ফূরণ সবচেয়ে বর্ণাঢ্যভাবে আমরা দেখতে পাই তাঁর কথায়। তাঁর অনবদ্য সব বক্তৃতা ও সাক্ষাৎকারের প্রতিটি বাক্যে, কথায়, শব্দে আমরা উপলব্ধি করি দুর্দশার চক্র ভেঙে আত্মশক্তিতে জেগে ওঠার আহ্বান। যা তাঁকে করে তোলে সততই অনন্য।

বিগত দেড় দশকে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের একাধিক অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তৃতা ও সাক্ষাৎকারে তাঁর বিশ্বাসের কথাগুলোই তিনি বলেছেন সহজাত হাস্যরস ও চিরায়ত গল্প–ঘটনা সহযোগে। অগণিত শ্রোতার হৃদয়জয়ী এ বক্তৃতাগুলো তাঁর অভিজ্ঞতাঋদ্ধ সম্পাদনায় হয়ে উঠেছে আরও দ্যুতিময় ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন।

‘ভাঙো দুর্দশার চক্র’ অধ্যাপক সায়ীদের সেইসব আলোকদীপ্ত বাক্যমালার একটি অসামান্য সংকলন-গ্রন্থ। এর পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ধরে এগিয়ে যেতে যেতে পাঠক ভেতরে ক্রমশ অনুভব করবেন ইতিবাচকতার চিরবাসন্তী সংগীত। নিজেকে আবিষ্কার করবেন আত্মজাগরণের পথযাত্রী হিশেবে।

প্রচ্ছদ: মাসুম রহমান

ভাঙো দুর্দশার চক্র

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
quantummethod.org.bd

ভাঙো দুর্দশার চক্র

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

ভাঙো দুর্দশার চক্র

আবদুল্লাহ্ আবু সায়ীদ

প্রকাশক

মায়িশা তাবাসসুম
কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক,
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৪১৪৪১, ৮৩৯৬৮১৫, ০৯৬১৩-০০২০২৫
০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩, ০১৭১১-৬৭১৮৫৮
E-mail : info@quantummethod.org.bd

গ্রন্থস্বত্ব

লেখক

প্রথম প্রকাশ

২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

প্রচ্ছদ

মাসুম রহমান

মুদ্রাকর

উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার
ইসলাম ভবন (২য় তলা)
৬৮ ফকিরাপুল বাজার রোড,
ঢাকা-১০০০

মূল্য

২০০ টাকা

Vango Durdoshar Chakra

Published by

Quantum Foundation
quantummethod.org.bd

Price : 15 $

উৎসর্গ

জামিলুর রেজা চৌধুরী

বাংলাদেশে প্রকৌশল ও
তথ্যপ্রযুক্তি জগতের অগ্রনায়ক

প্রকাশকের কথা

‘আলোকিত মানুষ চাই’ আন্দোলনের স্বপ্নদ্রষ্টা অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। অর্ধশতাব্দীকাল ধরে এদেশে বিচিত্র ও অভূতপূর্ব নানা কর্মোদ্যোগের জন্য তিনি সর্বমহলে বরেণ্য। একাধারে তিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ, নন্দিত টিভি-ব্যক্তিত্ব, পরিবেশ রক্ষার অগ্রণী সৈনিক, বইপড়া কর্মসূচির সার্থক রূপকার এবং সাহিত্য আন্দোলনের সফল সারথি ও একজন বহুমাত্রিক লেখক। এ সবকিছু ছাপিয়েও তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় হল, বরাবরই তিনি অদম্য আশাবাদে বিশ্বাসী এক মানুষ। এ বিশ্বাস নিঃশর্ত ও প্রশ্নাতীত, যা চারপাশের সকলের জন্য প্রেরণার উৎস।

আমরা আনন্দের সাথে বলতে পারি, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনও এই একই বিশ্বাস ও আশার শক্তিতে উজ্জীবিত ও গতিমান। কোয়ান্টাম বিশ্বাস করে–অযাচিত ভয় ও নেতিবাচকতার বৃত্ত ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারলে প্রত্যেক মানুষই হয়ে উঠতে পারে একেকজন আত্মজয়ী বীর। আর ব্যক্তিমানুষের এ জাগরণের পথ ধরেই সূচিত হতে পারে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সামগ্রিক পরিবর্তন।

বিশ্বাস ও চেতনার এমন সাদৃশ্য সমকালে বিরল। অধ্যাপক সায়ীদের চিত্তগ্রাহী আলোচনা কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের কাছে তাই সবিশেষ উদ্দীপনামূলক। তাঁর প্রতিটি বিশ্বাসদৃপ্ত উচ্চারণে আমরা খুঁজে পাই নিজেদের বিশ্বাসেরই অনুরণন। পৌঁছে যাই উপলব্ধির ভিন্ন এক স্তরে।

আমরা বিশ্বাস করি, কোয়ান্টামের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও সাক্ষাৎকারে বলা অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের প্রত্যয়ী কথামালা সর্বস্তরের পাঠককে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত ও সমৃদ্ধ করবে। হয়ে উঠবে আত্মজাগরণের শক্তিমান ও অবিনাশী অনুঘটক।

এ প্রত্যাশায় সবার সুস্বাস্থ্য, প্রশান্তি ও সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করি।

ভূমিকা

বিভিন্ন সময়ে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের নানা অনুষ্ঠানে আচমকা অনুরুদ্ধ হয়ে বেশ কটি বক্তৃতা করতে হয়েছিল। সেসবের অধিকাংশই যে খুব একটা মনঃসংযোগ করে করতে পারা গেছে তেমন নয়। এছাড়াও দুবার আমার দুটি সাক্ষাৎকারও নেওয়া হয়েছিল ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষে। সেগুলোও কিছুটা প্রস্তুতিহীনভাবে দেওয়া। এককথায় সবগুলোই ছিল কিছুটা উপস্থিত দায়শোধের মতো ব্যাপার। কিন্তু কোয়ান্টামের কর্মীরা যে সেসব বক্তৃতা আর সাক্ষাৎকার আদ্যোপান্ত অডিও-ভিডিও রেকর্ড করে রেখেছিল, তা আমার ভালোভাবে জানা ছিল না। জানলাম যেদিন তাঁদের পক্ষ থেকে ডা. আতাউর রহমান সেগুলোর অনুলিখন নিয়ে আমার কাছে এসে বলল, এগুলো কিছুটা ঘষামাজা করতে হবে, বই প্রকাশ করতে চাই। খুবই অপ্রতিভ অবস্থায় পড়তে হল। মুখের কথাকে লিখিত রূপ দেওয়া বেশ কঠিন। বহু কষ্টাকষ্টির পর এগুলোকে যে শেষপর্যন্ত চলনসই লেখার পর্যায়ে এনে দাঁড় করানো গেল, এটাই বাঁচোয়া। এখন পাঠকদের কৃপা পেলেই হয়।

বইটার নাম হতে পারত 'ইতিবাচকতার সপক্ষে'। সেটাই হত উপযুক্ত নাম। কিন্তু যেসব ভেঙে-পড়া আত্মবিশ্বাস খোয়ানো মানুষ সর্বাঙ্গীণ মানসিক শুশ্রূষার ভেতর দিয়ে সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাওয়ার আশায় কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনে এসে জড়ো হন, তাদের নৈতিক শক্তিকে জোরদার করার উদ্দেশ্য থেকেই এই নাম দেওয়া।

দুর্দশার চক্র ভেঙে আলো-উপচানো রাজ্যের অধিকার আমাদের পেতেই হবে। এ ব্যাপারে তিল পরিমাণ দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবকাশ নেই।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ
১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

সূচিপত্র

বক্তৃতা

১৩.
তৃপ্তির জন্য দাও, ভালোবাসার জন্য দাও

২০.
চলো জাগরণের দিকে

২৬.
নেতিবাচকতা একটা মায়া, একটা বিভ্রম, একটা মরীচিকা

৩৯.
অর্জনের চেয়ে বড়

৪১.
মুক্ত ও স্বাধীন জীবন

৪৮.
স্বপ্নের সম্ভাবনা

৫১.
কাজ, বিশ্বাস ও ইতিবাচকতা

৬৬.
আলোকিত জীবন

৬৮.
ইতিবাচকতার সপক্ষে

সাক্ষাৎকার

৮৮.
চাই আত্মশক্তি

১০৩.
স্বপ্ন ও সজ্ঞ

পরিশিষ্ট

১১৮.
জন্মদিনের কথা

(এই বইয়ে লেখকের পছন্দ অনুযায়ী বানান-রীতি অনুসরণ করা হয়েছে)

তৃপ্তির জন্য দাও
ভালোবাসার জন্য দাও

আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রফেসর এম আর খান, যাঁকে দেখলেই মনে খুশি আসে। খুশি আসে, কেননা নিজে তিনি সবসময় রয়েছেন একটা অলীক খুশির মধ্যে। শুভেচ্ছা জানাই শ্রদ্ধেয়া সভাপতি মাদাম নাহার আল বোখারীকে–কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সমস্ত কাজের ভেতর মূল ঝর্নাধারা হয়ে যিনি সবার মধ্যে শক্তি জোগাচ্ছেন।

সৌভাগ্যবশত সম্প্রতি আমার কণ্ঠস্বর প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। ডাক্তারদের মতে, অতিমাত্রায় বক্তৃতা করার ফলেই নাকি আমার এ অবস্থা। (সবার হাসি)। আপনারা হাসলেও আমার গলার স্বর শুনে আশা করি আসল ব্যাপারটা বুঝতেও পারছেন। দশকের পর দশক ধরে আমি শ্রোতাদের সামনে ক্লান্তিহীনভাবে বক্তৃতা করেছি। আমার ধারণা, গত ৪০ বছরে বিভিন্ন জায়গায় এরকম হাজার দশেক বক্তৃতা আমি করেছি। বিশেষ করে গত ২০ বছরে এদিক থেকে দেখলে বলা যায় জাতিকে আমিও কম রক্ত দিই নি (হাসি)।

কিছুদিন আগে আমি ডাক্তারকে বলেছি, গলাটা স্থায়ীভাবে নষ্ট করে দিতে, যাতে বক্তৃতার ঝামেলা চিরতরে চুকে যায়। দীর্ঘকাল বক্তৃতা করে করে আমি এখন ক্লান্ত। মাঝখানে গলার অবস্থা খুব বেশি খারাপ হয়ে

জাতীয় প্রেসক্লাবে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম আয়োজিত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য, ১৭ জুন ২০১১

গিয়েছিল। তখন বেশ আনন্দে ছিলাম। এখন কিছুটা ভালো হওয়ায় পুরনো চাকরি আবার ফিরে এসেছে।

এখানে এসে শুনলাম, যাদের রক্তদানের জন্য সম্মাননা জানানো হচ্ছে তাদের মধ্যে ৬৩ জন এমন মানুষ আছেন যারা এ-যাবৎ অন্তত ২৫ বার রক্ত দিয়েছেন। শুনে আঁতকে উঠলাম। কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে এক ফাঁকে স্যারকে (প্রফেসর ডা. এম আর খান) জিগ্যেস করলাম, স্যার, এদের গায়ে কি আদৌ আর রক্ত আছে? স্যার বললেন, আছে না কেবল, বেড়েছে। কথাটা মেনে নিলাম। এত বড় ডাক্তার! ছেলেবেলায় পাঠ্যবইয়ে পড়া একটা কবিতার লাইন মনে পড়ল : 'যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।' মনে হল স্যারের কথাটা সত্যিও হতে পারে। হয়ত দিতে দিতেই বেড়ে গেছে।

এর পরপরই ঘোষণা এল–একটি মেয়ে তার অনুভূতি ব্যক্ত করতে আসছে, যে এ-পর্যন্ত ১০ বার রক্ত দিয়েছে। শুনে আমি ভাবলাম, হয়ত কঙ্কালসার কেউ আসছে। তাকিয়ে দেখি, না, বেশ প্রাণবন্ত একটা মেয়েই মঞ্চে উঠছে। তখন নিজের জন্য দুঃখ হতে লাগল। মনে হল, ওর মতো ওভাবে রক্ত দিলে আমার চেহারাটাও হয়ত একটু ভালো হত।

ছোটবেলায় পড়া মার্কিন কবি জেমস রাসেল লোয়েলের একটা কবিতার দুটো লাইন মনে পড়ে :

> As one lamp lights another, nor grows less,
> So nobleness enkindleth nobleness.

একটা প্রদীপ যেমন হাজার প্রদীপকে প্রজ্বলিত করে কিন্তু নিজে কমে না, তেমনি মানুষের মহত্ত্বও অন্যকে মহৎ করে তোলে–নিজে এতটুকু না কমে। মানুষের রক্তও তা-ই। না দিলে ও নিজের শরীরের ভেতরেই মরে যাবে। কিন্তু দিলে অন্যের শরীরে গিয়ে তাকে নতুন জীবনের মধ্যে জাগিয়ে তুলবে। তখন আপনার তুচ্ছ রক্ত অন্যের জীবন হয়ে এই পৃথিবীতে কথা বলবে, গান গাইবে, হয়ত মানুষকে নতুন আশ্বাসে উজ্জীবিত করবে। তাদের মাধ্যমে আপনার রক্ত দীর্ঘকাল ধরে পৃথিবীতে পাতা মেলে ফুল ফুটিয়ে যাবে।

পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে অসহায় এবং দুর্বল

হচ্ছে মানুষ। দেখবেন, একটা গরুর বাচ্চা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দৌড় দেয়। আমি এটা বই পড়ে শিখি নি। নিজের চোখে দেখে শিখেছি। কিন্তু মানুষকে জন্মের পর অন্তত একটানা দুটো বছর বুকের সঙ্গে জড়িয়ে রাখতে হয়। সে থাকে একেবারেই অক্ষম। অথচ এই মানুষই একদিন হযরত মুহাম্মদ (স) হন, গৌতম বুদ্ধ হন, যিশুখ্রিষ্ট হন। আবার দুর্ধর্ষ চেঙ্গিস খান বা হিটলার হয়। গোটা পৃথিবীর চাইতেও বড় হয়ে ওঠে।

এমন যে অসহায় আর দুর্বল মানুষ, সে কী করে বেঁচে থাকে পৃথিবীতে? শুধু কি নিজের শক্তিতে? না। এরিস্টটল বলেছিলেন, 'মানুষ সামাজিক প্রাণী। সে বেঁচে থাকে তারই মতো মানুষদের শুভবোধের কারণে।' মানুষের চারপাশে অনেক মানুষ আছে বলে প্রতিটা মানুষ এ পৃথিবীতে বেঁচে আছে। ভূপেন হাজারিকার গান আছে না–*মানুষ মানুষের জন্যে/ জীবন জীবনের জন্যে/ একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না ...?* মানুষের মধ্যে এ সহানুভূতি জিনিশটা আছে। সবার জন্য সবার এটা আছে বলেই, সবার বাঁচায় সবাই বাঁচে বলেই মানুষ বেঁচে আছে। এ না হলে একা মানুষ পৃথিবীতে প্রায় কিছুই নয়। যে-কোনো মুহূর্তে সে হারিয়ে যেতে পারে।

একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই। ধরুন, আপনি আর আপনার একজন বন্ধু রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে গল্প করছেন। দুজন দাঁড়িয়ে আছেন মুখোমুখি। মগ্ন হয়ে গল্প চলছে। আপনি আছেন রাস্তার ভেতরের দিকে, সে আছে ফুটপাতের দিকে। এমন সময় আপনার বন্ধুটি হঠাৎ দেখল, একটা ঘাতক ট্রাক মাতালের মতো ছুটে এসে আপনাকে পিষে ফেলতে যাচ্ছে। যেন এক্ষুণি সব শেষ। এই সময় বন্ধুটি হঠাৎ আপনাকে আস্তে করে তার দিকে একটু টান দিল। ছোট্ট একটু টান, কিন্তু আপনার গোটা জীবন! আপনি বেঁচে গেলেন।

হয়ত এরপর অন্তত ৪০ বছর পৃথিবীতে আপনি বেঁচে থাকলেন। এই পৃথিবীকে দেখলেন। ভালোবাসলেন। এর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ উপভোগ করলেন। আনন্দ করলেন। কী কারণে? একটি মানুষ আপনাকে একদিন এক সেকেন্ডের জন্য এতটুকু সাহায্য করেছিল বলে, ছোট্ট একটু টান দেওয়ায় আপনি বেঁচে গিয়েছিলেন বলে।

মানুষের জীবনে মানুষের ভূমিকা এতটাই বড়। এভাবেই প্রতিদিন

চারপাশের চেনা-অচেনা অসংখ্য মানুষের সহযোগিতায়, সাহায্যে, মমতায়, ভালোবাসায় আমরা বেঁচে থাকি। পৃথিবীর সৌন্দর্য দেখি। এর আনন্দ উপভোগ করি। আমরা একা কিন্তু এমন নির্ভয়ে বাঁচতে পারি না। এরকম কোনো না কোনো বন্ধু পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের টান দেয় বলেই বেঁচে থাকি।

আপনি ভেবে দেখুন, এই যে আপনার হাতের ঘড়িটা। ঘড়িতে একটা চামড়ার বেল্ট আছে। বেল্টটা বেশ সুন্দর, হয়ত কোনো প্রাণীর চামড়া দিয়ে তৈরি। তাহলে কী দাঁড়াল? বেল্টটা তৈরির জন্য কোথাও না কোথাও প্রথমে একটা প্রাণীকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। তারপর নানা প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে সেই চামড়াকে একসময় আপনার হাতঘড়ির বেল্টের জন্য শোভাবর্ধক করে তৈরি করা হয়েছে। তার মানে, শুধু মানুষই যে আমাদের বাঁচিয়ে রাখে ও আমাদের জীবনের ব্যাপারে অবদান রাখে তা না; জীবজন্তু গাছপালা ধাতু পাথর রোদ হাওয়া নদী সমুদ্র বিশ্ব মহাবিশ্ব—এমনি কোটি কোটি জিনিশও ভূমিকা রাখে।

যা-হোক, এই বেল্টের ব্যাপারটায় আবার আসি। প্রথমেই একটি চতুষ্পদ প্রাণী এর জন্য তার নিজের চামড়াটা দিয়েছিল। কিন্তু তাতেই কি বেল্টটা হয়ে গেছে? তা তো নয়। এরপর ট্যানারিতে সেই চামড়াটাকে নানাভাবে প্রক্রিয়াজাত করে আমাদের হাতে চমৎকার বেল্ট হিসেবে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত কিন্তু ওর পেছনে কয়েকশ বা কয়েক হাজার লোক নানাভাবে অবদান রেখেছে। কিছু লোক সাধারণ চামড়া থেকে ওটিকে বেল্ট হিসেবে রূপান্তরের পেছনে, কিছু লোক ওর সৌন্দর্যবর্ধনে, কিছু লোক এর বাজারজাত করার কাজে, কেউ এর ব্যবসাবাণিজ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাজ করেছে।

একইভাবে ঘড়িটার অসংখ্য ছোট-বড় যন্ত্রগুলোর পরিকল্পনা, নকশা বা প্রযুক্তি প্রয়োগ থেকে ধাতু প্রক্রিয়াজাতকরণে বা অন্যান্য পর্যায়ে বহু বড় বড় ফ্যাক্টরি বা কারখানায় কাজ করেছে আরও অগণিত লোক। সব মিলিয়ে হয়ত ৫০ হাজার, এক লাখ বা কয়েক লক্ষ বা তারও বেশি মানুষের শ্রম আছে আপনার এই ছোট্ট ঘড়িটির পেছনে। এভাবে আপনার কাপড়চোপড়, জুতা, গয়না বা বেঁচে থাকার সামগ্রীর পেছনেও হয়ত কাজ করছে লাখ লাখ কোটি কোটি লোক।

চিন্তা করে দেখুন, এই যে এই মুহূর্তে আপনি এ ঘরে বসে আছেন, আপনার যাবতীয় চাহিদা পূরণ করছে কত অসংখ্য মানুষের শ্রম, ঘাম আর অবদান। তা না হলে এই সভ্য মার্জিত চেহারা নিয়ে আপনি আমি কিছুতেই এখন এ মুহূর্তে এখানে বসে থাকতে পারতাম না।

সুতরাং একজন মানুষের জীবন কোনো বিচ্ছিন্ন বা একক জীবন নয়। ব্যক্তিগত জীবনও নয়। সকল মানুষের মিলিত জীবন আর তার যোগফলের নামই হচ্ছে মানুষ। এজন্যই আমাদের পরস্পরকে পরস্পরের দিতে হয়। এভাবে যত দেব, মানুষ হিসেবে তত আমরা বড় বা সমৃদ্ধ জীবনযাপন করব। সবাই মিলে একটা সুখের জগৎ গড়ে তুলব। এই যে আমরা আজ রক্তদান নিয়ে কথা বলছি, অনুষ্ঠান করছি, এই রক্তদানও কিন্তু একটা দেওয়া। মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, উপকারের জন্য, মানুষকে সুখী করার জন্য এ এক নিঃস্বার্থ সম্প্রদান।

'বাঁধন' নামে একটা সংগঠন আছে। এরা রক্তদান নিয়ে কাজ করে। 'সন্ধানী' নামেও একটা বড় প্রতিষ্ঠান আছে। আমি নানা সময় ওদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গেছি। একটা কথা ওদের বলেছি–দেখ, রক্ত তুমি দিচ্ছ বটে কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, রক্ত কিন্তু তোমার নিজের জিনিশ নয়। এটা প্রকৃতি থেকে তোমার কাছে আসে। তবুও আমি রক্তদানকে দেওয়াই বলি। তোমার রক্ত বহু মানুষের জীবন হয়ে একদিন পৃথিবীতে কথা বলবে, বেঁচে থাকবে–এ দেওয়া ছাড়া কী?

একটু আগে মঞ্চে একজন থ্যালাসেমিয়া-আক্রান্ত মানুষ এসেছিলেন, তাঁর দেহে অনেক মানুষের রক্ত না থাকলে তিনি কি এখানে দাঁড়িয়ে আজ এভাবে কথা বলতে পারতেন? বহু আগেই তাঁকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হত। এই মানুষটি যেভাবে বেঁচে আছেন, এভাবেই মানুষ মানুষের কারণে বেঁচে থাকে। দেওয়া মানেই বাঁচা।

সুতরাং দাও। শুধু রক্ত নয়, সবকিছু দাও। দিতে শেখো। আমাদের দেশের মানুষ আজও কিছু দিতে শুরু করে নি। সবাই শুধু নেয়। শুধু চায়। নির্দয়তার পাথর দিয়ে কেবলই অন্যের হৃদয় ভেঙে দেয়। শুধু নেতিবাচক কথা বলে, শুধু হবে না, হবে না করে। শুধু বলে : কত দেখলাম, কিছুই হয় নি, কিছুই হয় না ..., বলে নিজেও আস্তে করে শুয়ে পড়ে। যে এত না না করবে, তার পক্ষে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকা কি সম্ভব?

আমরা বসতে পেলে প্রথমে শুতে, তারপর ঘুমাতে, তারপর মরতে চাই। তাই আমরা সারাটা জাতি এভাবে মরে আছি।

ভালো কিছু করতে চাইলে তাই কী করতে হবে আমাদের? প্রথমত, হৃদয়ের সততা দিয়ে ঐ ভালোতে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। এরপরও দিতে হবে অনেক কিছু। কী দিতে হবে? আমাদের যা-কিছু আছে। সম্ভব হলে সবই। রবীন্দ্রনাথের মতে, *আমার যত বিত্ত, প্রভু, আমার যত বাণী*—সব দিতে হবে।

তাই সামনে যারা বসে আছেন, বিশেষ করে তরুণদের বলি, দিতে শেখো। খুন করতে করতে মানুষ খুনি হয়, দান করতে করতে দাতা। ছোট জিনিশ দিতে থাকলে তুমি বড় কিছুকে, এমনকি তোমার নিজেকেও একদিন দিতে পারবে। এই দেওয়া যে কত বড় হতে পারে, দেওয়ার উন্মাদনায় মানুষ যে কী মরিয়া ও আত্মোৎসর্গী হতে পারে, আজকের এই অনুষ্ঠান তার প্রমাণ। মনে হচ্ছে, *শহীদী ঈদগাহে দেখ আজ জমায়েত ভারি*। ১০, ২০, ৫০ বার রক্ত দিয়েও কারও কারও দেওয়ার আনন্দ ফুরায় নি। আরও দিতে তাঁরা মাতোয়ারা। এঁরা বুঝেছেন দেওয়া মানে অন্যদের পাওয়া। তাই এঁদের দেওয়া লক্ষ লক্ষ ব্যাগ রক্ত যেমন মুমূর্ষু মানুষেরা পাচ্ছেন তেমনি এঁরা পাচ্ছেন তাঁদের। এই দেওয়া-নেওয়া আর সহযোগিতার হাত ধরে এগিয়ে চলেছে সভ্যতার আলো।

প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন, 'ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়।' এই সভার রক্তদাতারা তাঁর কথাকে মিথ্যা প্রমাণ করছেন। এঁরা সুস্থতার সংক্রমণ দিয়ে ব্যাধিগ্রস্তদের আরোগ্য করছেন। বিশ্বাস করি জাতির ভেতর এই দেওয়া একদিন আরও বাড়বে। বাড়তে বাড়তে এই লক্ষ ব্যাগ কোটি কোটিকে ছাড়িয়ে যাবে। সবাই সবার জন্য দেবে। দিতে দিতে সারা দেশ দেওয়ার উন্মাদনায় উন্মাতাল হবে। একটা সুন্দর স্বপ্নে-ভরা আনন্দময় ও বাসযোগ্য পৃথিবী তৈরি হবে।

আরেকটা কথা বলি, ঐ যে মেয়েটা ১০ বার রক্ত দিয়েছে, ও একটা কথা বলেছে। বলেছে, ১০ বার রক্ত দেওয়ার পর এখন ওর লোভ হচ্ছে ২৫ বার দেওয়ার। ওর বয়স কম, তাই ও এভাবে বলেছে। ওকে বলি, দাও, কিন্তু তা যেন লোভের জন্য না হয়। লোভ একটা স্থূল বৈষয়িক জিনিশ। খুবই নিম্নমানের। লোভে মানুষ মানুষকে খুন করে। লোভের

কারণে একজন আরেকজনের সর্বস্ব কেড়ে নেয়। তাই লোভের জন্য না, বরং আনন্দের জন্য দাও। দিতে ভালো লাগছে, তাই দাও। তোমার দেয়া রক্তে অনেক মানুষ বেঁচে থাকবে, সুখী হবে, তাই দেখে তোমার মন আনন্দে ভরে যাবে, সেজন্য দাও। যা দেবে, দেবার জন্য দাও। তৃপ্তির জন্য দাও। শান্তির জন্য দাও। মানবতার জন্য দাও। তুমি যত বড় দাতা বা যত বড় মানুষই হও, এই পৃথিবী থেকে একদিন চলে যাবে। এক্ষেত্রে রাজা আর ভাঁড়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

তাই চলে যাওয়ার আগে নিজের আনন্দে যতটুকু যা দিলে, তা দিয়েই নিজেকে সুন্দর করে গেলে। লোভ ডেকে আনে অশান্তি। লোভ দেয় যন্ত্রণা। মানুষ এতে কষ্ট পায়। গৌতম বুদ্ধ বলতেন, 'প্রত্যেকটা মানুষ বাসনার আগুনে জ্বলছে। সেই নরক যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচার একটা বড় উপায় : লোভ কমিয়ে ফেলা।' তাই চেয়ো না, দাও। প্রেমের জন্য, আনন্দের জন্য, মমতার জন্য, সুখের জন্য দাও। দেওয়া মানুষকে সার্থক করে। সেই সার্থকতার জন্য দাও।

চলো জাগরণের দিকে

আমি পড়েছি এক বিরাট সমস্যায়। ৩৬ ঘণ্টার এ কোর্সে আপনারা ৩৬ ঘণ্টাই উপস্থিত থেকেছেন। আমি থেকেছি মাত্র নয় ঘণ্টা। নয় ঘণ্টার উপস্থিতি নিয়ে ৩৬ ঘণ্টার অনুভূতি তুলে ধরা কঠিন। তাই আমি যা বলতে পারব তা এর সিকি ভাগ মাত্র।

আমি মনে করি, কোনোকিছু করতে হলে তা পুরোপুরিভাবেই করতে হয়। ফাঁকি দিলে তা খাঁটি হয় না। নামাজে দাঁড়ালে জীবন ঢেলেই সেজদা দিতে হয়। না দিলে কিছুই মেলে না। যা সম্পূর্ণ হয় না তা পুরোপুরি সত্যও হয় না। ছোটবেলায় একটা গান শুনতাম–

মিলতা হ্যায় কেয়া নামাজ মে
সেজদা মে যাকে দেখলে।

নামাজে সত্যি সত্যি কী আছে সেটা সেজদায় গিয়েই শুধু বোঝা যায়। কিন্তু আমি তো আপনাদের মতো পুরোপুরি সেজদায় যাই নি। মাঝে মাঝে গেছি, কিছু কিছু অনুভব করেছি। যতক্ষণ থেকেছি গুরুজীর অসাধারণ কথাগুলোয় মগ্ন থেকেছি, আবার সেটা আত্মস্থ হওয়ার আগেই দৌড় দিয়ে অন্য কাজে চলে যেতে হয়েছে। এই মুহূর্তেও আমার অন্যত্র থাকার কথা ছিল। কোনোরকমে ছাড়া পাওয়ায় আসতে পেরেছি।

মঞ্চে ওঠার আগে আমার হাতে একটা ছোট্ট চিরকুট এসে পৌঁছেছে। ‘স্যার, আসসালামু আলাইকুম। সবার জন্য তিন মিনিট। আপনার জন্য

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স ৩০০ উচ্ছ্বাস ১৪-এর প্রত্যয়ন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তব্য, মে ২০১০

১৫ মিনিট; চাইলে আরও বেশি হতে পারে।' কিন্তু সবার জন্য তিন মিনিট হলে আমার জন্য তো আসলে হওয়া উচিত ছিল ৪৫ সেকেন্ড–যেহেতু আমি হাজির ছিলাম তাদের মাত্র চার ভাগের একভাগ সময়।

যা-হোক, আপনারা অনেক আশা নিয়ে এখানে এসেছেন। অনেকে অনেক কিছু পেয়েছেনও। কেউ আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। কারো সাহস বেড়েছে। ভয়কে জয় করেছেন। আমারও কিছু হয়েছে। অন্তত ২৫ ভাগ তো বটেই। কিন্তু একটা জায়গায় এসে আমি হতাশায় প্রায় ডুবে গেছি। সেটা গুরুজীকে দেখে।

কয়েকদিন আগে আমি একটা জায়গায় বক্তৃতা করতে গিয়েছিলাম। সেখানে প্রায় আড়াই ঘণ্টা বক্তৃতা করতে হয়েছিল। শেষ করে চেয়ারে বসতে গিয়ে মনে হল সুখের স্বর্গে ডুবে গেলাম। আসলে এতটাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে, সামান্য চেয়ারে বসাটাকেও তখন বিরাট এক আরামের ঘটনা মনে হয়েছিল। আর গুরুজী! মোটামুটি একই বয়স আমাদের, অথচ এ চার দিনে ৩৬টা ঘণ্টা তিনি দাঁড়িয়ে কথা বললেন। না কোনো ক্লান্তি, না অন্য কিছু। এ দেখে নিজেকে একটা কথাই শুধু বলতে ইচ্ছে করে–'ওরে! তুই কি আছিস ... ?'

গুরুজীর অনেক গুণের আমি ভক্ত। তবে সামনাসামনি নাকি মানুষের প্রশংসা করতে নেই। এটা হাদীসের কথা। সামনে প্রশংসা করা আর তলোয়ার দিয়ে গলা কেটে ফেলা নাকি একই ব্যাপার। তবুও গুরুজীর গলা আজ কিছুটা হলেও আমি কাটব। ব্যথা লাগলেও কাটব। নইলে মন ভরবে না। যখন ১৫ মিনিটের লম্বা সুযোগ পেয়েছি, তখন আজকেই এ কাজ শেষ করতে হবে।

এর আগে কখনও গুরুজীর কথা আমি এভাবে শুনি নি। তাঁর কথা শুনে আমি নিশ্চিত হলাম যে, আজকের বাংলাদেশে যত মানুষ সুন্দর এবং চিত্তাকর্ষক কথা বলেন, গুরুজী তাঁদের সেরা। এমনিতেই তিনি সজীব প্রাণবন্ত হাস্যময় 'তরুণ'। চমৎকার তাঁর সবকিছু। আমি কয়েকবার তাঁর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করেছি। এমন শক্ত আর কঠিন হাত রে বাবা, আমার হাত আছে কি নেই সে বোধও কিছুক্ষণের জন্য নষ্ট হয়ে গেছে। এই মানুষকে ঈর্ষা না করে করবটা কী? আমরা সব মরে যাব আর উনি একা বেঁচে থাকবেন, এতটা তো সহ্য করা কঠিন।

এবার আসি তাঁর আলোচনার বিভিন্ন দিক প্রসঙ্গে। এমনিতেই আমাদের জীবন কষ্টে-দুঃখে প্রায় জীবন্মৃত, তার ওপর সংশয়, আশঙ্কা, ভয় আমাদের অবস্থা আরও খারাপ করে রাখে। অথচ গতিটা যে উল্টোমুখীও হতে পারে অর্থাৎ আমরা শুধু বেঁচে থাকতে পারি, তা-ই নয়; সুস্থ সবল দুর্বার হয়েও বাঁচতে পারি, ঝাঁপ দিতে পারি, জয় করতে পারি; নিজেদের পাপকে, ক্লেদকে, ভয়কে, ভেঙে পড়া বা মুষড়ে যাওয়া ধসকে উৎরে যেতে পারি; নিজেদের মধ্যে যা-কিছু দুর্বলতা, তাকে হটিয়ে মনের ভেতর সেই শক্তি জাগিয়ে তুলতে পারি যা দেশে-কালে পরাভবহীন–যার সামনে জীবনের অন্ধকার বিভ্রম বা অপছায়ারা সব মিথ্যা, এ কথাটা গুরুজী আমাদের প্রাণের মধ্যে গেঁথে দিয়েছেন।

এই কথাটাই কিছুটা অন্যভাবে আমি এক জায়গায় লিখেছি। বলেছি, একাত্তর সালে আমরা একটা যুদ্ধ করেছিলাম। সে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ। সে যুদ্ধ ছিল বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে। সে ছিল স্বল্পস্থায়ী। সেই যুদ্ধে আমরা জয়ী। আজ আমাদের শুরু হয়েছে সত্যিকারের যুদ্ধ–বড় এবং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ। সেই যুদ্ধ বাইরের শত্রুর বিরুদ্ধে নয়। প্রত্যেকের ভেতরের অশুভ শক্তিটার বিরুদ্ধে। নিজের অক্ষমতা, পাপ, ক্লেদ, লোভ ও পতনের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ। নিজের লালসা ও অযোগ্যতার বিরুদ্ধে এ সংগ্রাম। আজ আমাদের জাতিকে যদি বাঁচতে ও ঋদ্ধিমান হতে হয়, তাহলে এ যুদ্ধে জয় আমাদের চাই-ই চাই। কোয়ান্টামের আন্দোলন সেই যুদ্ধেরই একটা আশা-ভরা উদাহরণ।

আমার স্ত্রী এই কোর্সে এসেছিলেন বছর দশেক আগে। তাঁর তখন খুব সায়াটিকার ব্যথা ছিল। এখানে আসার দিনকয়েকের মধ্যে দেখলাম তিনি দিব্যি সুস্থ। প্রায় ভালো হয়ে গেছেন। ব্যথা-ট্যথা নেই। দেখলাম তিনি হাঁটাহাঁটি করছেন। তাঁর কাছে মেডিটেশনের কিছু ক্যাসেট ছিল, সেই ক্যাসেটগুলো দিয়ে আমিও বার কয়েক মেডিটেশন করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমি তখন ঠিক জানতাম না মেডিটেশন জিনিশটা আসলে কী এবং কীভাবে এ থেকে উপকার পেতে হয়। এবার এখানে এসে বুঝলাম, গুরুজীর এসব বক্তৃতা আসলে ওই মেডিটেশনগুলোরই ব্যাখ্যা। তাতে ব্যাপারটা বুঝতে আমার সুবিধা হল।

নিজের শক্তিকে বিশ্বাস করার ব্যাপারে অনেক বেশি উদ্বুদ্ধ হয়েছি।

আমাদের শক্তির চাইতেও আমরা যেন শক্তিশালী হয়ে গেছি। ফলে মাত্র চার দিনের মধ্যে আমরা নেতিবাচকতাকে অনেক বেশি মোকাবেলা করতে পারছি। অনেকটা যোদ্ধার মনোভাব আর ইতিবাচক চিন্তা নিয়ে সামনের দিকে এগোচ্ছি।

গুরুজীকে আগে আমরা মহাজাতক হিশেবে জানতাম। এ নামটা হয়ত ছিল তাঁর নিজেরই দেওয়া। এছাড়াও একটা নাম আছে তাঁর– শহীদ আল বোখারী। এটা হয়ত তাঁর বাবা, নানা বা পরিবারের কোনো প্রবীণ সদস্যের দেওয়া। কিন্তু 'গুরুজী' নামটা তাঁর কাছ থেকে উপকার পাওয়া কৃতজ্ঞ মানুষদের দেওয়া। এজন্য এই নাম এত গুরুত্বপূর্ণ। আশা করব, এই নামেই যেন ভবিষ্যৎকাল তাঁকে চেনে।

গুরুজী সঙ্ঘের কথা বলেছেন। আমি নিজেও সঙ্ঘ করি। বৌদ্ধ ধর্মে বলে, বুদ্ধকে শরণ কর। ধর্মকে শরণ কর। সঙ্ঘকে শরণ কর। শেষ কথাটার মানে সঙ্ঘ গড়ে তোলো। এই কাজটা না পারলে বড় বড় আইডিয়া ধ্বংস হয়ে যায়। ইসলাম ধর্ম আজও কী দিয়ে টিকে আছে? সঙ্ঘশক্তি দিয়ে। বৌদ্ধ ধর্ম টিকে আছে সঙ্ঘশক্তি দিয়ে। খ্রিষ্টান বা হিন্দু ধর্মও তা-ই। যদি সঙ্ঘ তৈরি করতে পারা না যেত, তাহলে বহু কিছু বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত।

আমি নিজেও সঙ্ঘ করতে চেষ্টা করি, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমি আধা-সাংগঠনিক লোক। আমার এক হাতে কবিতা, আরেক হাতে সংগঠন। কিন্তু গুরুজীর এই সংগঠন এমন নিপুণভাবে নির্মিত ও রচিত, এমন সুচারুভাবে পরিচালিত এবং এমন সুপরিকল্পনার সঙ্গে সারাদেশে ছড়িয়ে যাচ্ছে যে, আমি ক্রমে ক্রমে বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছি, আগামীকালের বাংলাদেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সামনে এ একটা অসাধারণ ঘটনার উদাহরণ হয়ে থাকবে।

গুরুজী বলেছেন, মেডিটেশন হল মনের একটা শান্ত-সুস্থির অবস্থা– যার একটির তিনি নাম দিয়েছেন : শিথিলায়ন। মেডিটেশনটি করলে বোঝা যায় মনের এই শান্ত ও শিথিল অবস্থাতেই মন হয়ে ওঠে সবচেয়ে শক্তিশালী। রবীন্দ্রনাথ একবার লিখেছিলেন, *উত্তেজনা এবং শক্তি এক নহে। ইহারা পরস্পরবিরোধী*। উত্তেজিত মুহূর্তে আমরা সবচেয়ে শক্তিহীন। এখানেও বলা হচ্ছে, *রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন*। কেন

হারব? কারণ সেই মুহূর্তে আমরা উত্তেজিত। তাই যুক্তি আমাদের মধ্যে কাজ করছে না। অথচ এর বিপরীতে যদি মনকে আমরা শান্ত ও যুক্তিপূর্ণ করে আনতে পারি তখন মনের ক্ষমতা বহুগুণ বেড়ে যায়।

একটা উদাহরণ দিয়ে বলি। যে মানুষটা দৌড়াচ্ছে তার মাথায় সহসা নতুন আইডিয়া আসতে চায় না। কিন্তু আপনারা লক্ষ করে দেখবেন, দাঁত মাজতে মাজতে অনেক নতুন আইডিয়া মাথায় চলে আসে। এর কারণ কী? কারণ দাঁত মাজার সময় আমরা আছি অবসরের মধ্যে, আলস্যের মধ্যে, বিশ্রামের মধ্যে, বিরতির মধ্যে। সেই বিপুল অবকাশের মধ্যে থাকায় আমাদের মন অফুরন্তভাবে সৃষ্টিশীল হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। এজন্য জ্ঞান-তপস্যার পাশাপাশি নিছক অর্থহীন আড্ডা থেকেও অনেক বড় বড় আইডিয়া এসেছে পৃথিবীতে। ব্যাপারটা লক্ষ করেই রবীন্দ্রনাথ শিল্প-সংগীত এসবকে বলেছেন : *অকাজের কাজ, আলস্যের সহস্র সঞ্চয়, আনন্দের শত শত আয়োজন।*

এবার একটু নিজের কথায় আসি। আমি চিরদিন আশার কথা বলি। আশায় বিশ্বাস করি। আমার একটা বইও আছে *আমার আশাবাদ* নামে। কিন্তু মাঝখানে দুবছরের একটা অসুস্থতা আমার মনকে কিছুটা বিমর্ষ ও তছনছ করে দিয়েছিল। বেশ খানিকটা ভেঙে গিয়েছিলাম তখন। মনের ভেতর যে ব্যাপারটা ঘটছে, আমি তখনও তা ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি। তখনও আগের মতোই আশার কথা বলে চলেছি, কিন্তু কোথায় যেন তাল কেটে যাচ্ছে। মাঝে মাঝেই বিশ্বাস টলে উঠছে। সামান্য কাজ করতে গেলেও মনে হচ্ছে এটা কি হবে, আমি কি পারব, আমার দ্বারা কি সম্ভব? টের পাচ্ছি আমি যেন কিছুটা ভেঙে পড়ছি।

একসময় দেখলাম আমি ঠিকমতো কাজও করতে পারছি না। না পারছি লিখতে, না পারছি গুছিয়ে কথা বলতে। প্রথমে আমি ধরতে পারি নি, আসলে আমার আত্মবিশ্বাসে ধস নেমেছে বলেই এমনটা হচ্ছে।

এই সময় একটা পত্রিকার সম্পাদক বাসায় এসে আমার একটা বড় ইন্টারভিউ করলেন। কিন্তু সাক্ষাৎকারের শুরু থেকেই আমার কণ্ঠে হতাশার গান। সম্পাদক অবাক হয়েই বললেন, 'আপনি তো চিরকাল আশার কথা বলেন। আজ আপনার গলায় নৈরাশ্যের সুর কেন?'

একটু হোঁচট খেলাম। ভাবলাম হয়ত বার্ধক্য, জরা আমাকে নির্জীব

করে ফেলেছে। হয়ত প্রতিটা মানুষের জীবনেই এমনটা ঘটে, তাই সবকিছুর ওপর এই আস্থাহীনতা। নানা দার্শনিক যুক্তি দিয়ে সম্পাদকের প্রশ্নটাকে পাশ কাটিয়ে বাঁচার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু পরে অনুভব করলাম, আমার মধ্যে সত্যি সত্যি একটা নৈরাশ্য বাসা বেঁধেছে। ভাবলাম, কেন হল এমনটা? মনে হল, আমার সেই অসুখের দুশ্চিন্তায় আমি হয়ত ভয় পেয়ে গেছি। মৃত্যুচিন্তা আমার দখল নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু তখনও আমি বিষয়টা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি নি। যখন গুরুজীর বক্তৃতা শুনতে শুরু করলাম, বুঝলাম, আমার ভেতরটা আসলে ভীত হয়ে পড়েছে বলেই এমনটা হচ্ছে। ক্লান্তিতে, রুগ্নতায় আমি সাহস হারিয়ে ফেলেছি। আমার জীবনীশক্তি ক্লান্ত হয়ে গেছে।

গুরুজীর কথা শুনে আমি আগের সেই ইতিবাচক মনটাকে আবার ফিরে পেলাম। ঠিক করলাম, আর নেতিবাচকতা নয়। আর কোনো মিনমিন টিমটিম নয়। সাহসী হতে হবে। যা করতে যাব তার ওপর বিশ্বাসী হয়ে অন্ধের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। জীবনে যা হবার তা যখন হবেই তখন ইতিবাচক হয়েই তার মোকাবেলা করা উচিত। নেতিবাচকতা মনের মধ্যে কথা বলতে চাইলেই ঝট করে ইতিবাচকতার দিকে সরে যেতে হবে। তাঁর কথা শোনার প্রথম ৩০ মিনিটের মধ্যেই আমার এই উপলব্ধিটা হয়েছিল।

একটা কথা এ মুহূর্তে মনে পড়ছে, হিন্দু ধর্মে বলা হয়, যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেলে ক্ষত্রিয় স্বর্গে যায়। সারাজীবন কথাটা আমি বিশ্বাস করেছি। ভেবেছি যেন যুদ্ধের মাঠে মরি। বিছানায় শুয়ে যেন আমার মৃত্যু না হয়। ভেঙে পড়বার মুখে এ বিশ্বাস আমি আবার ফিরে পেয়েছি। গুরুজী এই যে পুনরুজ্জীবন ঘটালেন–যে আমি কিছুটা ঝিমিয়ে পড়ছিলাম, তাকে যে আবার সঠিক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিলেন, সেজন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এই মুহূর্তে ঐ মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাটুকু না পেলে এই ক্ষত জীবনের গভীরে চলে যেতে পারত।

ধন্যবাদ।

নেতিবাচকতা একটা মায়া, একটা বিভ্রম, একটা মরীচিকা

আমি এক জায়গায় লিখেছি, উপদেশ যে দেয় আর যে নেয় দুজনের মধ্যেই কিছু না কিছু গোলমাল আছে। যে শোনে তার মধ্যে গোলমাল তো আছেই, না হলে সে উপদেশ চাইবে কেন? আর যে উপদেশ বিলিয়ে বেড়ায় সে আসলে উপদেশ শোনায় অন্যকে, কিন্তু দেয় নিজেকে। এ কারণে উপদেশ দেয়ার ব্যাপারে আমার আগ্রহ নেই।

এ মুহূর্তে আমার দ্বিতীয় বিপদ হল, আমি মঞ্চে এসে দাঁড়াতেই হঠাৎ কাগজে একটা বিষয় লিখে আমাকে ধরিয়ে দিয়ে বলা হল–এর ওপর কিছু বলতে হবে। হঠাৎ করে কিছু বলতে গেলে আমি সবসময়ই বোকা হয়ে যাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটা প্রবন্ধে লিখেছিলেন, তোমরা পাঠ্যবইয়ের ওপর কখনও 'বাধ্যতামূলক' কথাটা লিখো না; যেমন, বাধ্যতামূলক গণিত বা বাধ্যতামূলক ইংরেজি। কেননা এমন বহু ছেলেমেয়ে আছে, যারা ওই 'বাধ্যতামূলক' শব্দটা দেখলেই অবাধ্য হয়ে ওঠে। আমারও এমন একটা রোগ আছে। বক্তৃতার বিষয় ঠিক করে দিলে পৃথিবীর সব বিষয়ের ওপরই বলতে পারি, শুধু ওটি ছাড়া।

তবে শুনলাম, বিষয়টা আমার ওপর চাপিয়ে দেয়া নয়। যে বিষয়ে আমাকে বলতে বলা হয়েছে সেটা নাকি আমারই কথা। কোয়ান্টামের কোনো একটি অনুষ্ঠানে আমিই নাকি কথাটা বলেছি। কথাটা হল :

কোয়ান্টাম আলোকায়ন কার্যক্রমে প্রদত্ত বক্তব্য, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১০

নেতিবাচকতা একটা মায়া, একটা বিভ্রম, একটা মরীচিকা। এটা কখন, কী পরিস্থিতিতে কেন বলেছিলাম কিছুই মনে নেই। যদি জানতাম, নিজের কথার ওপরেই আমাকে বক্তৃতা করতে হবে, তবে হয়ত কথাটা সেদিন বাদ দিয়েই বলতাম।

যা-হোক, অন্তত একটা বিষয় দিয়ে শুরু করা যাক। বিষয়টা হল 'ভয়'। লেখক বুদ্ধদেব বসু তাঁর প্রথম যৌবনে থাকতেন ঢাকার পুরানা পল্টনে। তিনি তাঁর একটা গল্পে লিখেছেন, আমরা পুরানা পল্টনে যেখানে থাকতাম সেখানে একটা বটগাছ ছিল। সেই বটগাছে চিলের কান্না শুনে 'ভয় পেতে ভালবাসতুম।' তো দেখা যাচ্ছে, ভয় যে সবসময় ভীতিকর তা কিন্তু নয়। ভয় পেতে অনেক সময় আমাদের ভালোও লাগে। সব আবেগের মতো ভয়কেও যদি শিল্পমণ্ডিত করে প্রকাশ করা যায়, ভয় তখন মানুষের কাছে প্রাণপ্রিয় না হলেও মোটামুটি উপভোগ্য ব্যাপার হয়ে উঠতে পারে। আমাদের টেনশনও অনেকটা তা-ই।

মানুষ শুধু বলে, টেনশন থেকে বাঁচার উপায় কী। অথচ দেখুন, টেনশন মানুষের অন্যতম প্রিয় জিনিশ। এ না হলে আমরা প্রায় বাঁচিই না। আমরা ডিটেকটিভ ছবি, সাসপেন্স ছবি, ভূতের ছবি, ভয়ের ছবি এত দেখি কেন? টেনশনের লোভেই তো। নাটকীয়তা জিনিশটা তো একটা টেনশনই। টেনশন জীবনযাপনের এক মজাদার মশলা। নাটকীয়তাহীন জীবন যেমন আটপৌরে, টেনশনহীন মানুষও তেমনি নির্জীব। সবাই জগতে কিছু না কিছু টেনশন করে। টেনশন না থাকলে টেনশন খুঁজে বেড়ায়। চিকিৎসাশাস্ত্রে বলে, সুস্থ থাকার জন্য টেনশন দরকার। বলা হয় মাইল্ড টেনশন ইজ গুড ফর হেল্‌থ। অল্প মাত্রার টেনশন স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। জীবনের ভেতর এ উদ্যম জাগিয়ে দেয়।

টেনশন ভালো কিন্তু মাত্রায় বেশি হলে এ ক্ষতিকর। যেমন বাঁচতে হলে খেতে হয়। কিন্তু অতি খাওয়া অসুস্থতা এমনকি মৃত্যুরও কারণ হতে পারে। শীতের রাতে আগুন পোহানো আরামদায়ক কিন্তু চুলোর মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দেওয়া নয়। টেনশনও তেমনি।

ভয়ও তা-ই। অল্প ভয় আনন্দের কিন্তু বেশি ভয় ভয়াবহ। আমার ধারণা, যা-কিছু মানুষকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেয়, ভয় তার একটা। আমরা যাদের রিপু বা শত্রু বলি যেমন : কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ

মাৎসর্য–এরা সবাই মাঝেমধ্যে আমাদের ক্ষতি করে। কিন্তু ভয় আমাদের ক্ষতি করে প্রতিদিন। সীমা অতিক্রম করে গেলে ভয় সত্যি ভয়ংকর।

ব্যাপারটাকে তাই সীমার মধ্যে রাখতে হবে। সবকিছুর বেলাতেই এ সত্যি। সব ধর্মেই বলা হয়েছে মধ্যপন্থাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। কিন্তু আমরা সবসময় সীমালঙ্ঘন করি। জীবনকে পরিপূর্ণ উপভোগের লোভে সীমালঙ্ঘন না করেও পারি না; আবার করেও নির্মম শাস্তি পাই।

পৃথিবীশুদ্ধ মানুষ যে নেতিবাচকতা নিয়ে আজ এত কথা বলছে, যার হাত থেকে বাঁচার পথ খুঁজছে, সেই নেতিবাচকতার উৎসও কিন্তু ভয়। কখন আমি মানুষের সামনে দাঁড়াতে দোনোমনা করব? ভয় যখন আমাকে দুর্বল করে ফেলবে, তখনই তো। কখন আমি সাহস হারিয়ে ফেলব, মনে হবে আমি পারব না; আমি হেরে যাব ভেঙে পড়ব। যখন ভয় আমার আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দেবে, তখনই তো। ভয় আমাদের জন্মান্ধ শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়, চিন্তাভাবনাকে অক্ষম আর ওলটপালট করে ফেলে। পরিণামে আমরা নেতিবাচক হয়ে পড়ি। হেরে যাই।

সুতরাং আসুন আমরা জাগি, উঠে দাঁড়াই। যেভাবে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন–*মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্রে দাঁড়াও দেখি সবে*–তেমনিভাবে উন্নতশিরে, পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসে। আসুন মরীচিকা, বিভ্রম আর মায়ায় ভরা অশুভ নেতিবাচকতাকে মোহাম্মদ আলী ক্লে-র মতো বলিষ্ঠ মুষ্ঠাঘাতে উড়িয়ে দিয়ে, ইতিবাচকতার দীপ্র উজ্জ্বল রাজ্যে আমরা হো হো করে হাসি।

ভয় ব্যাপারটা কেমন তা নিয়ে নিজেরই একটা ব্যক্তিগত গল্প বলি। ঘটনাটা সেদিনের। হঠাৎ একটা দাঁতে কনকনে ব্যথা শুরু হয়ে গেল। ডাক্তার বললেন, দাঁতটার রুট ক্যানাল করতে হবে। দেখতে পাচ্ছি দাঁতের কথা ওঠায় আপনারা অনেকেই মৃদু মৃদু হাসছেন, যেন পৃথিবীতে একমাত্র আমারই দাঁতে ব্যথা হয়। বন্ধুগণ, এ সবারই হয়। আপনাদের অনেকেরও হয়েছে। যাদের হয় নি তারা একটু ধৈর্য ধরুন। আসিতেছে শুভ দিন।

সবাই জানেন রুট ক্যানাল করার আগে মাড়ির পেছনে আর দাঁতের গোড়ায় বেশ কটা ইঞ্জেকশন দিতে হয়। আগেও আমি বহুবার দাঁতের রুট ক্যানাল করিয়েছি। অনেক ইঞ্জেকশন নিয়েছি। কখনও এ নিয়ে মনে

কোনো দ্বিধা হয় নি। ইঞ্জেকশন দেওয়ার আগে-পরে ডাক্তারদের সঙ্গে নানা ব্যাপার নিয়ে হাসিতামাশাও করেছি। কিন্তু এবার ইঞ্জেকশনের কথা ভাবতেই আমার ভেতর ভয় শুরু হয়ে গেল। এর কারণ কাগজের একটা খবর। একদিন কাগজ খুলতেই দেখলাম, 'দাঁত তুলতে গিয়ে একজনের মৃত্যু'। আর সেটা ঘটেছে দেশের একটি বড় হাসপাতালে।

খবরটা পড়তেই বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। হঠাৎ মনে হল আমারও তো কিছুদিনের মধ্যেই দাঁত তুলতে হবে। আমিও কি তাহলে ওভাবে ...। মনে নানা প্রশ্ন জাগতে লাগল। আচ্ছা, ইঞ্জেকশন দিতে গিয়ে লোকটা মারা গেল কেন? এনেসথেশিয়াটা কি খারাপ ছিল? রক্তচাপ কি অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে দিয়েছিল? হৃদযন্ত্র বন্ধ করে দিয়েছিল? এমনও তো হতে পারে, কোনো নতুন বা শিক্ষানবিস ডাক্তার ইঞ্জেকশন দিতে গিয়ে কিছু একটা উল্টাপাল্টা করে ফেলেছে। আমার ইঞ্জেকশনের ওষুধটাও যদি ওরকম হয়! তাছাড়া কে না জানে, দাঁত মস্তিষ্কের একবারে কাছে। দাঁতে কিছু হলে ধাঁ করে তা মগজে ধরে যায়। এমনও তো কিছু হয়ে যেতে পারে। নানা বাস্তব অবাস্তব দুর্ভাবনায় বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করতে লাগল। কেন যেন মনে হতে লাগল, নির্ঘাত ওরকমই একটা কিছু আমার হবে।

পরের দিন গেলাম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে। সেখানেও পড়ল মরার ওপর খাঁড়ার ঘা। কে এক অতিথিমতো ভদ্রলোক হঠাৎ করে ওই খবরটা নিয়েই আলাপ শুরু করলেন। শুনে আরেকজন বলল, আরে, ছেলেটা তো দাঁত তুলতে মারা যায় নি, ইঞ্জেকশনটা যখন দিচ্ছিল তখনই শেষ হয়ে গেছে। আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। আমি তো যাচ্ছি একই ব্যাপারে। ইঞ্জেকশন দেবার সময় যদি ...? কে জানে...? ক্রমাগত ওই বিপদের কল্পনা আমার মাথার ভেতর লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে লাগল। টেনশন অসহ্য হয়ে উঠলে আপাতত রুট ক্যানাল করা থেকে পালানোর কথা ভাবতে লাগলাম।

ডাক্তারের সঙ্গে এপয়েন্টমেন্ট ঐ দিনই রাত ন'টায়। সন্ধ্যা ছ'টায় ডাক্তারকে ফোন করে বললাম, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা মিটিং থাকায় আজ আসতে পারছি না। আরেকদিন আসব। কী করে সেই ভয় থেকে উদ্ধার পেয়েছিলাম সেটা অনেক বড় গল্প। কিন্তু দেখুন, কীভাবে ছোট্ট

একটা ভয় আমার সব সাহস গুঁড়িয়ে দিয়ে আমার আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে দিয়েছিল। সামান্য একটা দাঁতের ইঞ্জেকশন নিতেও আমি অপারগ হয়ে পড়েছিলাম।

ধরা যাক, আপনি কলেজের নাটকে অভিনয় করার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। আপনাকে নেওয়া হয়েছে নায়কের রোলে। না, এমনি এমনি নেওয়া হয় নি। নেওয়া হয়েছে আপনি যোগ্য বলেই। আপনার চেহারা ভালো, কণ্ঠ ভালো, সংলাপ বলা সুন্দর–এককথায় সবদিক থেকে আপনি নায়কোচিত। রিহার্সাল চলছে জোরেশোরে। আপনি অভিনয়ও করছেন চমৎকার। কারো মনে সন্দেহ নেই যে, নির্ধারিত দিনে আপনি অসাধারণ অভিনয় করবেন।

কিন্তু এদিকে একটা জায়গায় হঠাৎ কিছুটা অসুবিধা দেখা দিতে শুরু করল। অভিনয়ে নাম দেবার পরের দিন থেকেই আপনি লক্ষ করলেন অভিনয়ের কথা মনে হলেই আপনি যেন বুকের ভেতর একটা মৃদু হৃৎস্পন্দনের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। আওয়াজটা প্রতিদিনই অল্প অল্প করে বাড়ছে। খুবই উৎকট সেই শব্দ। টের পেলেন আপনার বুকের ভেতরটা সারাক্ষণ অতিকায়ভাবে ধুক ধুক করছে। চূড়ান্ত ঘটনাটি ঘটল অভিনয়ের দিন। মঞ্চে উঠে আপনি টের পেলেন আপনি অদ্ভুতভাবে সংলাপ ভুলে যাচ্ছেন। আপনার অভিনয় খারাপ হচ্ছে। যা-কিছু করলে আপনি সেরা অভিনেতা হতে পারতেন, সেগুলো ছাড়া আপনি সবই করছেন।

প্রায় একই রকম ব্যাপার অনেকসময় দেখা যায় বাংলাদেশ ফুটবল টিমের বেলায়। ধরা যাক, বাংলাদেশ কোনো দেশের সঙ্গে ফুটবল খেলছে। বাংলাদেশ দলের একজন খেলোয়াড়কে বারে বারে চোখে পড়ছে। খুব ভালো খেলছে সে। একবার দেখা গেল বিপক্ষ দলের বেশ কজন খেলোয়াড়কে পুরো কাটিয়ে বল নিয়ে ওদিকের গোলকিপারের একেবারে সামনে চলে গেছে সে। এখন তাকে বাধা দেয়ার কেউ নেই, এখন পা দিয়ে আস্তে করে বলটাকে ছুঁয়ে দিলেই গোল। সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ জয়ী। 'বাংলাদেশ বাংলাদেশ' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠবে দেশের কোটি কোটি মানুষের কণ্ঠ।

ঠিক সে-সময় হঠাৎ কী যেন হয়ে গেল আমাদের সেই খেলোয়াড়ের মাথায়। যে বলটাকে আস্তে করে ছুঁয়ে দিলেই গোল, সেই বলটাকে নিয়ে

সে করে বসল অদ্ভুত এক কারবার। সে এমন জোরেই কিক্ করল যে বলটা গোলবারের ওপর দিয়ে চলে গেল অথবা সেটাকে আলতো করে গোলকিপারের হাতে তুলে দিয়ে বীরদর্পে ফিরে এল।

কেন হল এটা? ভয়ে। কীসের ভয়? সাফল্যের ভয়। 'ওরে আব্দুল কুদ্দুস, তুই শেষে কিনা নায়কের ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করে ফেলবি? এ্যাঁ, তু-ই!' কিংবা : ওহে খেলোয়াড়, স্টেডিয়াম ভর্তি মানুষ তোর প্রশংসায় উদ্বেল হয়ে উঠবে, মুহুর্মুহু করতালিতে মুখর হবে দেশের দর্শক। গোটা বাংলাদেশ অভিনন্দনে মেতে উঠবে। পত্রপত্রিকা তোর রঙিন ছবিতে ভরে যাবে। সারাদেশে তোর জয়ধ্বনি করবে! এত বিরাট মানসিক চাপ সে সহ্য করতে পারে না। যে এর আগে জীবনে কোনোদিন বড় কিছু পায় নি, এত বড় বিরাট প্রাপ্তির চাপ সে কী করে সহ্য করবে! ফলে যা করার তার ঠিক উল্টোটা করে সে ফিরে আসে।

একজন অভুক্ত মানুষ, যে অনেকদিন খেতে পায় নি, তার সামনে যদি পৃথিবীর সব সেরা খাবার সাজিয়ে রেখে হঠাৎ বলেন, এসব শুধু তোমার, শুধু তোমার জন্য, ঝটপট সাবড়ে ফেলো তো এগুলো–তাহলে সে যেভাবে দিশাহারা হয়ে পড়বে, ভয় আর অবিশ্বাস নিয়ে যেভাবে পালিয়ে যাবে, আত্মবিশ্বাসহীন মানুষদেরও হয় ঠিক সেই অবস্থা। যুগ যুগের অপ্রাপ্তি, পরাজয়, আতঙ্ক আর অবিশ্বাস তাকে এমনভাবে গুঁড়িয়ে ছোট করে রেখেছে যে, সামনে কোনো ন্যায্য প্রাপ্তি বা সাফল্য এলেও নিজেকে সে তার যোগ্য ভাবতে পারে না।

এ ধরনের ভয়কে বাড়তে দিলে তা আমাদের ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় করে তোলে। আমাদের মধ্যে হীনম্মন্যতা দেখা দেয়। আমরা সবকিছুর ওপর ভরসা হারিয়ে নেতিবাচক হয়ে উঠি। কিন্তু যদি খেলায় এক দুই করে জয় শুরু হয়, বা অভিনয়ে সাফল্য আসতে শুরু করে তবে সেই খেলোয়াড়ের মতো আমাদেরও আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়, নিজেদের আমরা অসম্ভবের নায়ক বলে বিশ্বাস করতে ভালোবাসি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমরা নেতিবাচক হয়ে উঠি ভয়ে, আত্মবিশ্বাসের অভাবে। এই ভয় থেকে বের হবার প্রধান উপায় হল কাজের জগতে ক্ষান্তিহীনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়া। জীবনকে আক্রমণ করা। তা থেকে সাফল্য ছিঁড়ে আনা। ভয়ের ওই অশুভ প্রেতটাকে ঝেঁটিয়ে

আমরা যদি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি তবে আমরা বিশ্বরাজ্যের রাজা। আমরা জয়ী, সফল, দুর্নিবার।

ভয় নানাভাবে আমাদের ক্ষতি করে। আজও বহু মানুষ আছে যারা প্লেনে উঠতে ভয় পায়। ওড়ার প্রযুক্তিটির ব্যাপারে জ্ঞান না থাকার কারণেই এটা হয়। সেজন্য দেখবেন, এদেশ থেকে যখন কেউ হজে বা বিদেশে যায় তখন গ্রামশুদ্ধ আত্মীয়স্বজন এয়ারপোর্টে এসে হাজির হয়। মনে হয় যেন ফুল-মাল্য দিয়ে একেবারে চিরবিদায় দিতে এসেছে। ভাবখানা এমন : যে জিনিশে উঠছে, ওতে উঠে কেউ কি আর জ্যান্ত ফিরে আসে?

আমার নিজেরও এই ভয় ছিল। দেশের ভেতরে প্লেনে তবু ওঠা যায়, ওটা আকাশে উঠতে না উঠতেই নেমে পড়ে। কিন্তু যখন প্রথম বিদেশে গেলাম, মনে হল, প্লেন চলছে তো চলছেই ..., থামার কোনো মতলব নেই দেখছি! যত সময় যায় তত আতঙ্ক বাড়ে। এ কি আর কোনোদিন নামবে না নাকি? প্রথমবার বিদেশযাত্রার আগে এ আতঙ্ক এমন ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল যে, যাত্রার দিন-পনেরো আগে থেকে আমি প্রতি রাতে দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলাম। প্রথম রাতে দেখলাম আমাদের প্লেনটা হঠাৎ সোজা ওপরের দিকে উঠতে শুরু করে একসময় প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হয়ে চারপাশে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। এরকম দিনের পর দিন দুঃস্বপ্ন—একটা আরেকটার চাইতে ভয়ংকর।

আমি তখন এ ব্যাপারে পড়াশোনা শুরু করলাম। ধীরে ধীরে জানলাম প্লেনগুলো একেকটা একশ থেকে দুশ টন ওজনের। (ইদানিং এসেছে সাড়ে তিনশ টনের প্লেন।) এখন প্রশ্ন, ১৮০ টনের প্লেন আকাশে ওড়ে কী করে? কী করে এ সম্ভব? যার অর্থ একটাই : আসলে ওগুলো উড়ছে না, নিচের দিকে পড়ছে। ভয়ে আমি আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় বিশ্বাস হারিয়ে ফেললাম। তার ওপর ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি, প্লেন নামলেও প্লেনের চাকা অনেক সময় নামে না। আবার পেছনের চাকা নেমেছে তো সামনের চাকা নামার হদিস নেই। নানা ধরনের দুশ্চিন্তায় মন দিশেহারা হয়ে উঠল।

অনেক মানুষের মধ্যেই কিন্তু এ ধরনের বিচিত্র রকমের ভয় আছে। পৃথিবীর ইতিহাসের একজন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী মাও সেতুং, অথচ প্লেনে ওঠার

ভয়ে কোনোদিন নাকি তিনি চীনের বাইরে যান নি। প্লেনের মতো এমনি আরও কত ধরনের ভয় যে আছে পৃথিবীতে। ভূতের ভয়, মঞ্চে দাঁড়িয়ে কথা বলার ভয়, পরীক্ষার ভয়, মৃত্যুভয়, এমনি হাজারো ভয়ে আমরা সর্বক্ষণ কণ্টকিত। বিশেষ করে চাকরির সাক্ষাৎকারের ভয়ের মতো ভয়ংকর জিনিশ আর হয় না।

সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে ভয়ে মাথা অনেকসময় এমন গুবলেট হয় যে, চাকরিটাই হয় না। হাজার দু-তিন টাকা বেতনের চাকরি হলে তবু মুখ থেকে কথা বেরোয়, কিন্তু বেতন ৭০-৭৫ হাজার হলে মুখ পুরো বন্ধ হয়ে যায়। ভয় পেয়ে 'হবে না, হবে না', 'পাব না, পাব না' করতে করতে আমাদের ভয় অনেকসময় বিশ্বাসে পরিণত হয়ে যায়। আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আমরা তখন ভুল করতে থাকি। ভয়ের কথা বেশি ভাবার ফলে কাজের জায়গায় ভুল করি।

এখন প্রশ্ন, তাহলে আমরা কোনোকিছু পারি কখন? পারি তখনই যখন বলতে পারি–'পারবই'। সাক্ষাৎকারপ্রার্থীদের মধ্যে আমিই শ্রেষ্ঠ। আমার চেয়ে যোগ্যতর বা উচ্চতর কেউ নেই। আত্মবিশ্বাসদৃপ্ত হয়ে যদি বলতে পারি, তোমাকে আসতেই হবে হে চাকরি, আজ হোক কাল হোক তোমার না এসে নিষ্কৃতি নেই। স্বেচ্ছায় আসতে চাইলে এসো, সেটাই সৌজন্যসম্মত। না হলে তোমাকে হাত ধরে টেনে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে নিয়ে আসব। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, *ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার*। ভীরু কিছুই পায় না জগতে। না চাকরি, না জয়, না গৌরব। এ পায় সাহসীরা। আসুন আমরা তাই সাহসী হই। দুর্জয় আক্রমণে জীবনকে লুট করে আনি। ভয় থাকলে যে প্রেমও করা যায় না, সব লেজেগোবরে হয়ে যায় তারও জলজ্যান্ত একটা উদাহরণ শুনুন।

ঘটনাটা আমার সচক্ষে দেখা। আমাদের সময়ে ইউনিভার্সিটিতে খুব সুন্দরী একটি মেয়ে পড়ত। তার প্রেমে পড়েছে আমাদের সে সময়কার মিস্টার ইউনিভার্সিটি। নিয়মিত ব্যায়াম ও শরীরচর্চা করা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে সুঠাম সুন্দর যুবক সে। শক্তিতে দ্যুতিতে যেন ঝকঝক করছে। সে গেছে ওই মেয়ের কাছে প্রেম নিবেদন করতে। মনে মনে হয়ত ভেবেছিল মেয়েটার সামনে গিয়ে বলবে, আমি মিস্টার ইউনিভার্সিটি, আপনি মিস ইউনিভার্সিটি, সুতরাং ...। তার ভাবনাচিন্তা যুক্তিপূর্ণ।

কিন্তু মেয়েটার সামনে গিয়েই তার যুক্তিটুক্তি মুহূর্তে হাওয়া। দেখা গেল, এই প্রচণ্ড বলিষ্ঠদেহী যুবকটি কথা বলবে কী, মেয়েটার সামনে দাঁড়িয়ে শুধু হাত কচলাচ্ছে আর ঘামছে। না ঘেমে উপায়টা কী? ও তো প্রেম শেখে নি, শিখেছে পেশিচর্চা। বেচারা ভাবতেও পারে নি, এইসব মিষ্টি রূপসীদের থাপ্পড় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন মুষ্টিযোদ্ধাদের মুষ্ঠাঘাতের চাইতে কম নয়। আপনারাই বলুন, এদের প্রেম হওয়ার কি কোনো সম্ভাবনা আছে? হয়ও নি তা শেষমেশ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মিস্টার ইউনিভার্সিটিও কোথাও কোথাও ভয় পায়। এরকম ভয়ের আক্রমণে আমরা সবাই প্রতিনিয়ত ছিন্নভিন্ন। অথচ বলুন, জীবনে আসল বিপদ ঘটে কয়টা? পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখুন তো, জীবনে যত দুঃস্বপ্নে বিপর্যস্ত হয়েছেন, তার কয়টা দুঃস্বপ্ন বাস্তবে ঘটেছে? অনেকসময় ভয়াবহ বিপদের মুখে বুদ্ধিশুদ্ধি এমন লোপ পেয়ে বসে যে, তখন বিপদকে বিপদ বলে বোঝাই যায় না। অর্থাৎ বিপদ হয়েও তা তখন বিপদের যন্ত্রণা দেয় না। আমার দুবার হয়েছে ওরকম।

এক রাতে একটা পিকআপ গাড়ি চালিয়ে মফস্বল থেকে ঢাকা ফিরছি। হঠাৎ রাস্তার ওপর অন্ধকারে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে থাকা একটা মালবোঝাই ট্রাকের সঙ্গে আমার গাড়ির জোর ধাক্কা লাগল। সংঘর্ষটা এমন যে, আমার গাড়ির সামনের ইঞ্জিন পুরোটাই প্রায় চুরমার হয়ে গেল। বিহ্বল অবস্থায় দু-তিন মিনিট পর্যন্ত বুঝতেই পারলাম না কী হয়েছে। অর্থাৎ সে-সময়টায় আমার নিশ্চয়ই কোনো বোধশক্তি ছিল না। তখন যদি মারা যেতাম, খুবই আরামের সঙ্গে হয়ত মৃত্যু হত। সাধারণত বিরাট বিপদের সময় যে ক্ষতি আমাদের হয়, তা আমাদের অজান্তেই হয়। অত ভাবাভাবির সময় দেয় না।

কিন্তু এমন বিপদই বা কয়টা জীবনে? আমরা তো তুচ্ছ ইঞ্জেকশনের মতো ছোট ছোট ভয়ে দাঁতে কপাটি লেগে পড়ে থাকি। দুঃসহ আতঙ্কে ভাবি, এই যন্ত্রণার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো। কিন্তু এসব মিথ্যা বিভ্রম আর মরীচিকাকে জীবন থেকে কি ঘাড় ধরে বের করে দেওয়া যায় না?

আমার ধারণা, এসব থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে সুস্থ ও ইতিবাচক হয়ে থাকার উপায় একটাই–সবসময় ভাবতে থাকা : ভালো কিছু হবে। প্লেনে বসে আমরা যদি চাঁদে পাওয়া মানুষের মতো চারপাশের দৃশ্য দেখে

ভাবতে পারি—আহা কী সুন্দর নীল একটা আকাশ, নিচে কী অনবদ্যভাবে ঢেউ খেলানো হলুদ মরুভূমি, পর্বতগুলো কী অনবদ্য, বরফ ঢাকা, শাদা শাদা মেঘগুলো কী আশ্চর্যভাবে তাদের গায়ে লেগে আছে! অথবা যদি ধরে নিই আমার এই গোটা প্লেন ভ্রমণটাই একটা দিবাস্বপ্ন, সত্য হল দূরের সেই প্যারিস শহর—যেখানে আমি যাচ্ছি। ধরা যাক, আমি যেন ঘুরে বেড়াচ্ছি আইফেল টাওয়ারের আশেপাশের বাগানে, ওর চূড়ায় উঠছি, চোখ ভরে দেখে নিচ্ছি ল্যুভ মিউজিয়াম, নটরডেমের গির্জা বা সঁজে লিজের রমণীয় পরিবেশ, প্রাণভরে প্যারিসের অন্যান্য সৌন্দর্য উপভোগ করছি; এককথায় সুন্দর সুন্দর চিন্তা বা কল্পনা দিয়ে মনটাকে ভরে দিই। নেতিবাচক কোনোকিছুকে একদম মনে জায়গা না দিই তাহলে তো অনেকখানি আনন্দে ভরে থাকতে পারি।

দৈনন্দিন জীবনের অন্ধকার ভাবনা থেকে বাঁচার উপায় হল, কোনো আনন্দময় কাজের মধ্যে মাতালের মতো বুঁদ হয়ে যাওয়া বা মাঝে মাঝেই বন্ধুবান্ধব বা অন্য কোনো মানুষ জুটিয়ে দু-চারদিনের জন্য কাছের বা দূরের কোনো নতুন জায়গা থেকে ঘুরে আসা, যাতে মনোযোগটা অন্যদিকে সরে যায়। এমনি করতে থাকলে ভয়টা ধীরে ধীরে মন থেকে সরে যায়।

আমার প্লেনে চড়ার ভয়টা কীভাবে কাটল, সে গল্প বলি। একবার আমরা যাচ্ছি দলবল নিয়ে নিউইয়র্ক থেকে নায়াগ্রা ফল্‌স দেখতে। যে দোকান থেকে গাড়ি ভাড়া নেওয়া হচ্ছে তার ম্যানেজারকে আমাদের একজন সঙ্গী জিগ্যেস করল, আচ্ছা, রাস্তাটা খারাপ হবে না তো! শুনে ভদ্রলোক তাকে একটা আশ্চর্য কথা বললেন। বললেন, 'কখনোই ভাববে না খারাপ কিছু হবে। সবসময় ভাববে : ভালো হবে। খারাপ খারাপ করতে থাকলে সবকিছুই খারাপ হয়ে যায়। মন ভয়ের চিন্তায় ভরে ওঠে। এতে মানুষ বিমর্ষ হয়ে পড়ে।' শুনে মনে হল, তাই তো! আমরা তো যাচ্ছি আনন্দ করতে। পথে নেমে এভাবে খারাপ খারাপ করছি কেন? সবসময় ভাবতে হবে—ভালো কিছু হবে। এ ভাবতে পারলেই আমরা যাত্রাটাকে সত্যিকার উপভোগ করব। তখন রাস্তা খারাপ হলেও ততটা খারাপ লাগবে না।

আরেকদিন লন্ডনে এক দোকানে গেছি কিছু একটা কিনতে।

জিনিশটা নিয়ে দোকানের লোকটাকে জিগ্যেস করলাম, জিনিশটা ভালো হবে তো? দোকানিও ঐ একই কথা বলল। বলল, 'সবসময় ভাববে ভালো হবে। তাহলে দেখবে সব ভালো হয়ে গেছে।' এ দুটি ঘটনা থেকে বুঝলাম, পাশ্চাত্যের প্রায় প্রতিটি মানুষের মধ্যে কথাগুলো আজ কীভাবে গেড়ে বসে গেছে। তুচ্ছ লোকেরাও আজ কথাটাকে কী গভীরভাবে বিশ্বাস করে! ফলে ভালোমন্দ নিয়ে অযথা ভেবে ভেবে তারা তাদের আনন্দের মুহূর্তগুলোকে নষ্ট করে না। তাছাড়া মৃত্যু বা দুর্ঘটনা তো কত লক্ষ কোটিভাবেই আমাদের জীবনে আসতে পারে। কখন কীভাবে কোথায় আসবে আমরা কি জানি? তাহলে কেন ঐ বেচারা নিরাপদ বাহনটিকে কিংবা রাস্তাটাকে সন্দেহ করে ওদের অযথা দোষী বানাই? বা প্রতিটা মুহূর্তকে মৃত্যুমুহূর্ত বানিয়ে আতঙ্কে ভরে থাকি?

এরপর থেকে প্লেনে উঠে আমি আর দুঃস্বপ্ন দেখি না। সারাক্ষণ টিভি পর্দায় ফিল্ম দেখে, গান শুনে বা বই পড়ে গোটা সময়টা কাটিয়ে দিই। ইতিবাচক হয়ে উঠতে আমাদের খুব বেশি কিছু লাগে না। আনন্দের ভেতর মেতে উঠতে পারলে তা অনায়াসেই দরজায় এসে দাঁড়িয়ে যায়।

সবাই তো আপনারা মেডিটেশন করেন। মেডিটেশনে কি কোথাও বলা হয়, তোমরা ভয় পেয়ো না, নিরাশ হয়ো না বা নেতিবাচক হয়ো না। এককথায়, দুঃখ আতঙ্ক ব্যর্থতা দুর্ঘটনার কথা কি ফিরে ফিরে বলে? নাকি বলা হয়, আপনি ভেঙে পড়েছেন, ধসে গেছেন, এসব থেকে উঠে দাঁড়ান? আপনারা দেখবেন এসব নেতিবাচক কথা সেখানে নেই। কেননা বার বার ভাঙন আর ধসের কথা শুনলে আপনি এমনিতেই ধসে যাবেন।

তাই এতে আছে আশার কথা, ইতির কথা, মনকে উৎফুল্ল করার কথা। কেননা শান্ত মনই পারে কোনো কথাকে সবচেয়ে শক্তিশালীভাবে আত্মস্থ করতে। সেখানে বলা হয় আনন্দের কথা, নীল আলোর কথা, রূপের রাজ্যে আমাদের পদচারণার কথা। কী সুন্দর কাব্যময় বর্ণনা! সুন্দর ওয়েটিং রুমের গল্প, মনের বাড়ির গল্প, ঝর্নার শব্দ, পাখির গান– এসব দিয়ে মনটাকে স্নিগ্ধ আর ঝরঝরে করে তোলা হয়। এক স্বপ্নময় অনিন্দ্য জগতে আমাদের সরিয়ে নেওয়া হয়। আমরা তখন চলে যাই অলৌকিক আনন্দের এক অনির্বচনীয় ভুবনে।

অর্থাৎ পুরোপুরি ইতিবাচকতার ভেতর। এভাবে মন যখন স্বনির্দেশ

গ্রহণ করার জন্য পুরোপুরি উপযোগী হয়ে ওঠে অর্থাৎ মনের গ্রহণক্ষমতা সবচেয়ে প্রখর আর শক্তিশালী অবস্থায় পৌঁছায় তখন গভীর নীরবতার মধ্যে আপনি দু'মিনিট ধরে নিজেকে বলে যান–আমি এক অজেয় মানুষ। আমার অসাধ্য কিছু নেই। আমি সব পারব, আমি পৃথিবী জয় করব।

আসলে মনের সেই প্রশান্ত মুহূর্তে নিজেকে এসব কথা বার বার বলে নিজেকে আপনি পরিণত করেন সত্যিকার এক দুর্জয় মানুষে। তখন সত্যি সত্যি আপনি পৃথিবী জয় করে বসেন। জেগে ওঠেন দুর্দম আত্মশক্তিতে। কাজেই নেতিবাচকতার বিভ্রম ও মরীচিকা আর নয়, চাই দুর্বার উজ্জ্বল ইতিবাচকতা–জীবনকে সুখী করার জন্য, পৃথিবীকে জয় করার জন্য।

নিজের ভেতরের ইতিবাচকতা বাড়াতে আমি একটা পদ্ধতি অনুসরণ করি। আমি কল্পনা করি, বিশাল মহাশূন্যে দুটো গোল বেলুন ভাসছে–একটা শাদা, একটা কালো। শাদাটা তুলনামূলক বড়। ওটা হল ইতিবাচকতার প্রতীক। কালোটা নেতিবাচকতার, ওটা ছোট। একসময় এক ঝটকায় আমি কালো বেলুনটাকে আকাশ থেকে মুছে দিই। কালো বেলুন বলে তখন আর সেখানে কিছু নেই। আছে কেবল শাদাটা। অর্থাৎ সারা আকাশজুড়ে রয়েছে শুধু ইতিবাচকতা, উজ্জ্বলতা আর আলো।

শেষপর্যন্ত ইতিবাচকতাই জীবনকে বাঁচায়। এর মধ্য দিয়েই আমরা হয়ে উঠি নিজেদের অধীশ্বর। ঐ যে মেডিটেশনে বলা হয়–বলুন, 'আমি এক অনন্য মানুষ, আমার অসাধ্য কিছু নেই'–এসব বলতে বলা হয় সেজন্যই।

পৃথিবীতে খারাপের চেয়ে ভালো অনেক বেশি। না হলে জগৎ ধসে পড়ত। সুতরাং যে ইতিবাচকতা জগতকে ধারণ করছে, বিশ্বচরাচরকে সামনে এগিয়ে নিচ্ছে, তা-ই হোক আমাদের নিয়তি। আসুন, একে আমরা বিশ্বাস করি, এর জন্য সংগ্রাম করি। এ দিয়েই তৈরি হোক জীবনের বিজয় স্তম্ভ।

আর একটা ব্যাপার আছে : 'কাজ'। জীবনের যাবতীয় দুঃখ কষ্ট গ্লানি বঞ্চনা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় এটি। কাজ নয় শুধু, আনন্দের কাজ। ক্ষান্তিহীন নিরবচ্ছিন্নভাবে জীবনকে সজীব করার মতো। মনের একটা খুব বড় গুণ আছে। আমরা যদি মনের মতো কাজের মধ্যে

নিজেদের ডুবিয়ে দিতে পারি, তবে জীবনের ভেতর দ্বিতীয় কিছুর জায়গা এমনিতেই কমে যায়। তাই কাজ করা মানেই ইতিবাচক হয়ে ওঠা। আমি সবসময় বলি, কাজ হচ্ছে গঙ্গাজল। কাজের মধ্যে বেঁচে থাকা মানে জীবনোল্লাসের মধ্যে বেঁচে থাকা। নেতিবাচকতা তখন আর স্পর্শ করতে পারে না। আসুন, সেই স্বপ্নে আমরা উজ্জীবিত থাকি, কাজের মধ্যে বেঁচে থাকি। ভালো থাকি।

অর্জনের চেয়ে বড়

সংস্কৃত ভাষায় একটা শব্দ আছে–‘দেভ্‌তা’। শব্দটির মানে যিনি দেন। বাংলায় এর প্রতিশব্দ ‘দেবতা’। এই দেবতা আকাশে থাকেন না, থাকেন মাটিতে, আমাদের চারপাশে। নিজেদের নিঃশেষ করে অন্যকে দিয়ে তাঁরা আমাদের কৃতজ্ঞ করেন।

আমরা তখন পাবনায় থাকি। ক্লাস এইটে পড়ি। একদিন স্কুলের স্কাউটিং স্যার বললেন, ‘ইছামতি ব্রিজটার নিচে কচুরিপানা বিশ্রীভাবে জমে গেছে, নদীটা মরে যাচ্ছে। চলো আমরা সবাই মিলে ওগুলো পরিষ্কার করে দিই।’ আমরা হৈ হৈ করে রাজি হয়ে গেলাম।

একদিন সকালবেলা আমরা ৪০-৫০ জন স্কাউট গিয়ে নামলাম নদীতে। প্রচণ্ড রোদের মধ্যে ঘেমে-নেয়ে কাজ করতে করতে যখন প্রায় দুপুর হল, হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, নদীর সেই অংশটা স্বচ্ছ পানিতে টলমল করছে। নোংরা আর দুর্গন্ধ সরে গিয়ে নদী ঝকঝকে হয়ে উঠেছে। দৃশ্যটা দেখে গভীর শান্তিতে বুকের ভেতরটা ভরে গেল। একটা ভালো কাজ করতে পারার আনন্দে খুব ভালো লাগল। হঠাৎ মনে হল, শুধু নিজের জন্য নয়, সবার জন্য এই যে কষ্টটা করলাম, এর মধ্যে এক অদ্ভুত তৃপ্তি আছে। সেদিনই প্রথম বুঝলাম–পাওয়ার মধ্য দিয়ে নয়, মানুষের বড় আনন্দ দেওয়ার মধ্য দিয়েই।

আমি মনে করি, আজ এখানে সমবেত রক্তদাতাগণও এমনি

কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম আয়োজিত প্রথম সহস্র আজীবন স্বেচ্ছা রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তব্য, ৬ জুলাই ২০০৩

একেকজন দেবতা–যাঁরা কোনো ব্যক্তিগত বা স্থূল লাভের জন্য নয়, শুধু রোগগ্রস্ত দুঃখী মানুষকে ভালোবেসে, সেইসব অচেনা অজানা মুমূর্ষু মানুষকে বাঁচাবার জন্য আনন্দে রক্ত দিচ্ছেন। এই দেওয়ার জন্য আমি তাদের অভিনন্দন জানাই। শত শত মানুষের এই বিন্দু বিন্দু দানের প্রবণতা দেখে চারপাশের দুরপনেয় নৈরাজ্য আর হতাশার মধ্যেও এ ভেবে আশা জাগে যে, এর মধ্য দিয়েই তৈরি হচ্ছে আগামী দিনের উচ্চতর ও মানবিক বাংলাদেশ।

রক্ত কোনো দুর্লভ বা মহামূল্যবান জিনিশ নয়। সবার মধ্যেই এ রয়েছে। দিতেও তেমন কষ্ট বা ঝুঁকি নেই। নেই, কিন্তু অন্যকে ভালোবেসে, পরের দুঃখে দুঃখী হয়ে সবাই কি এ দেয়? দিতে বললে মনে হয় হীরা জহরত বা কোহিনূর মণি কেউ চেয়ে বসেছে, বুকটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। না, মানুষের রক্ত হীরা জহরত বা কোহিনূর মণি নয়, নেহায়েতই প্রকৃতি থেকে পাওয়া সাধারণ বা গড়পরতা জিনিশ।

কিন্তু রক্ত দেয়ার মধ্য দিয়ে আজকের এই রক্তদাতারা এই যে একটু একটু করে দিতে শিখছেন, ভালোবাসার নামে উৎসর্গ করতে শিখছেন, এই শিক্ষা মূল্যবান। কেননা এভাবে সামান্য জিনিশ দিতে দিতে একদিন তাঁরা এমন বড় ও মূল্যবান কিছু দিতে পারবেন, যা তাঁরা অনেক অনেক ত্যাগ আর দুঃখের মধ্য দিয়ে অর্জন করেছেন। কবিতা লিখে লিখেই না মানুষ একদিন কবি হয়।

আজ এই রক্তদানের দৃশ্য দেখে এমন দিনের প্রত্যাশা করলে হয়ত ভুল হবে না যে, দেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারাই সক্ষম বা সমর্থ তারা সবাই একদিন এভাবেই রক্ত দিতে এগিয়ে আসবেন। আমাদের রক্তদাতার সংখ্যা সেদিন আর হাজারের মধ্যে সীমিত থাকবে না, এ হবে আমাদের গোটা জনসংখ্যার সমান। তখন রক্তের অভাবে কাউকে আর পৃথিবী ছাড়তে হবে না। এটা সেই ধরনের একটি দেওয়া, যার ভেতর দিয়ে একটি দেশ একটু একটু করে উঁচু শিখরকে জয় করে। একটা জাতি তখনই তার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে পারে, যখন তার ভেতরে থাকে এমন অসংখ্য মানুষ বা দেবতা–যারা আত্মত্যাগে পরাঙ্মুখ নন।

মুক্ত ও স্বাধীন জীবন

একে একে সবাই বলেছেন। মঞ্চে উঠবেন এমন কাউকে আর দেখছি না। আশঙ্কা করছিলাম এবার হয়ত আমারই পালা। সবচেয়ে ভালো হত যদি নিজেকে বলতে পারতাম–ওরে, যেভাবে যে পথে পারিস 'পালা'। এ বলার কারণ আছে। আমি মানুষটা খুবই ধীরগতির। হঠাৎ করে কিছু বলতে হলে পারি না। তাই এই পালানোর প্রয়াস।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের ছাত্র এবং শিক্ষকরা সামনে বসে আছেন, তাদের উদ্দেশ্যে এখন আমাকে কিছু বলতে হবে। এরকম অনুষ্ঠানে কিছু বলার মানে : কিছু উপদেশবাণী বর্ষণ করা। কিন্তু ভয় নেই, আমি উপদেশ দেব না। উপদেশ দিতে সে-ই পারে, যে নির্ভুল। স্খলন-ত্রুটির সম্পূর্ণ ওপরে। কিন্তু আমি তো ত্রুটিহীন মানুষ নই। অন্যকে কী করে আমি উপদেশ দেব?

হযরত মুহম্মদ (স)-এর জীবনের সেই ঘটনাটা তো আপনারা সবাই জানেন। তাঁর কাছে একবার এক লোক এসেছেন–তার ছেলে বেশি মিষ্টি খায় সে ব্যাপারে তাঁকে বলতে। তার ইচ্ছা রসুলুল্লাহ (স) যেন তার ছেলেকে বেশি মিষ্টি খেতে নিষেধ করে দেন। রসুলুল্লাহ (স) তাকে বললেন ছেলেকে নিয়ে সাত দিন পরে আসতে। সাত দিন পরে লোকটি তার ছেলেকে নিয়ে এলে রসুলুল্লাহ (স) ছেলেটিকে বেশি মিষ্টি খেতে বারণ করলেন। ছেলেটার বাবা কৌতূহলের বশে রসুলুল্লাহ (স)-কে

বান্দরবান লামার কোয়ান্টামম সফরকালে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বক্তব্য, ২৬ নভেম্বর ২০১০

তখন জিগ্যেস করলেন, আপনি তো সাত দিন আগেই কথাটা ওকে বলতে পারতেন। দেরি করলেন কেন? তখন উত্তরে তিনি বললেন, দেখ, এই সাত দিনে আমি মিষ্টি খাওয়া কমিয়েছি। তাই আজ তোমার ছেলেকে বলতে পেরেছি যে, তুমি বেশি মিষ্টি খেয়ো না। সেদিন বললে আমার কথা আর কাজে মিল থাকত না।

রসুলুল্লাহ (স) ছিলেন মহামানব। কিন্তু আমি তো সাধারণ মানুষ। অজস্র ত্রুটি-বিচ্যুতিতে ভরা। সেসব বিচ্যুতি সংখ্যায় এত বেশি যে, তা থেকে মুক্ত হওয়া আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। এই অবস্থায় উপদেশ দেওয়া কি আমাকে মানাবে?

আজ বিকেলেই আমি এখানে এসেছি। এটুকু সময়ের মধ্যে যা যা দেখেছি, সত্যিই খুব ভালো লেগেছে। বহুরকম কাজ এখানে চলছে। এর পাশাপাশি ভাগ্যাহত ও দরিদ্র পরিবারের শিশুদের উন্নত চেতনার মানুষ হিশেবে গড়ে তোলার সাধ্যমতো চেষ্টাও করা হচ্ছে। সবকিছু মিলিয়ে এখানে একটা অনন্য ও আশাব্যঞ্জক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এসবের মধ্যে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের বহুমুখী সৃজনশীলতার ভিন্ন একটি পরিচয় আমি পেয়েছি।

কয়েকদিন আগে একটি টিভি-অনুষ্ঠানে আমাকে একজন জিগ্যেস করেছিল, আপনি সৃষ্টিশীল কাজ বাদ দিয়ে সংগঠন করতে গেলেন কেন? আমি বললাম, দেখ, আমাদের দেশের মানুষের একটা সাধারণ ধারণা হল সংগীত নাটক সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান এগুলোই শুধু সৃষ্টিশীল জিনিশ। কিন্তু আমাদের জাতি একটা কথা এখনও জেনে ওঠে নি যে, পৃথিবীতে যত ধরনের সৃজনশীলতা আছে, তার মধ্যে সংগঠনও একটি অতি উন্নত মাপের সৃষ্টিশীল কাজ। সংগঠন সৃজনশীলতার একটি অত্যন্ত শাণিত স্তর। কাজেই আমি সৃষ্টিশীল কাজ বাদ দিয়ে সংগঠন করতে আসি নি। সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে আমি আসলে সৃষ্টিশীল কাজই করছি।

আজকে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো কোন দিক থেকে আমাদের ওপরে? কী দিয়ে? সেখানে গান আছে, সাহিত্য আছে, চিত্রকলা আছে, স্থাপত্য আছে, দর্শন বিজ্ঞান সবই আছে। এসব তো আমাদেরও আছে। তাহলে পার্থক্য কোথায়? তারা আমাদের ছাড়িয়ে ওপরে উঠল কী দিয়ে? আমি বলব সংগঠন দিয়ে। এই সংগঠনের অভাবে, আমরা এমন ভোঁতা

হয়ে আছি। কী দিয়ে দুর্ধর্ষ চেঙ্গিস বর্বর মোঙ্গলদের নিয়ে এত বিশাল একটা সাম্রাজ্য গড়ে তুললেন বা ব্রিটিশরা গড়ে তুলল পৃথিবীর বৃহত্তম উপনিবেশ? সংগঠন দিয়েই তো!

আমরা আজ পর্যন্ত আমাদের রাষ্ট্রটিকে সুসংহত করতেও পারি নি। তাকে ভালো করে দু-পায়ের ওপর দাঁড় করাতেও পারি নি। হয়ত আজও আমরা সংগঠনের গুরুত্ব ঠিকমতো বুঝি নি। '৭১ সালে আমরা স্বাধীনতা পেলাম, ব্যাপারটা আমাদের জাতির জীবনে একটা বিরাট ঘটনা। আমাদের কী হবে, কীভাবে হবে, আমাদের ভাগ্যে কী ঘটবে–এসব চিরকালই নির্ধারণ করেছে বাইরের লোকেরা। তাদের ইচ্ছাই ছিল আমাদের বিধিলিপি। আমরা নিজেদের ভাগ্য কোনোদিন নিজেরা নির্মাণ করতে পারি নি। স্বাধীনতা অর্জনের পর আমাদের হাতে সেই ক্ষমতা এসেছে। এসেছে, কিন্তু এখনও তা কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্রপদ্ধতি হয়ে ওঠে নি।

কেন ঘটছে এসব? এ-ও তো সংগঠনের অভাবেই। এ থেকে বোঝা যায় সংগঠনের সৃজনশীলতায় আমরা এখনও কত অযোগ্য। আজ আমাদের দেশজুড়ে যে নৈরাজ্য, সহিংসতা, অন্ধকার, মূল্যবোধের অবক্ষয় বা বিশৃঙ্খলতা চলছে–সবমিলিয়ে যে অরাজক পরিস্থিতি–এর মূলেও আছে মজবুত রাষ্ট্র সংগঠনের অভাব; যার ফলে দুর্বৃত্তপনা আজও দেশে বিরাজ করছে সীমাহীন মাত্রায়। একটা গল্প বলে বিষয়টা বোঝানোর চেষ্টা করি। বিভিন্ন জায়গায় আমি গল্পটা বলেছি।

দুই বন্ধু সিনেমা হলে গেছে সিনেমা দেখতে। হলের ভেতর ঘুটঘুটে অন্ধকার। একসময় শুরু হল সিনেমা, লাইট পড়ল পর্দার ওপর। আলোর ছটায় পর্দা উঠল উজ্জ্বল হয়ে। হঠাৎ তাদের মনে হল, দুজনের ঠিক সামনে বড়সড় কী একটা যেন ঝলমল করে উঠল সেই আলোতে। তাকিয়ে দেখে একজন মোটাসোটা লোক বসে আছে, মাথায় গোল চকচকে ইয়া বড় একটা পরিপূর্ণ টাক। তার ওপর আলো পড়াতেই ওটা এমন ঝলমল করে উঠছে।

দুই বন্ধু তখন ভাবল, সামনে এমন একটা লোভনীয় জিনিশ পড়ে আছে, অথচ এ দিয়ে কিছুই করা যাচ্ছে না, এ বড় দুঃখের ব্যাপার। বন্ধুদের মধ্যে একজন বড়লোক, একজন গরিব। বড়লোক বন্ধুটি হঠাৎ গরিবকে ফিসফিস করে বলল, তুই যদি ওই টাকের ওপর জোরে একটা

চড় মারতে পারিস আর উল্টো মার না খাস তবে এবার পাবি আরও এক হাজার টাকা।

আর যায় কোথায়! বন্ধুটি সঙ্গে সঙ্গে লোকটার মাথায় জোরে একটা চড় মেরে খলখল করে বলে উঠল, 'আরে ভাই আবদুল্লাহ, তুই অন্ধকারে এখানে একলা চুপ করে বসে আছিস, আমি তোকে দেখতেই পাই নি। তা কেমন আছিস? ভাবি কেমন? বাচ্চারা?' বলে মহা উল্লাসে সবার খবর নিতে শুরু করে দিল।

লোকটা রাগে প্রায় লাফিয়ে উঠল। আবদুল্লাহ? কীসের আবদুল্লাহ? কার নাম আবদুল্লাহ? আমার নাম আবদুল্লাহ নাকি? আপনি আমাকে আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ বলে দিব্যি মাথায় একটা চড় মেরে দিলেন! বলে চোখ লাল করে গজগজ করতে লাগল। বন্ধুটি বলল, 'কী বললেন আপনি? আপনি আমার প্রিয় বন্ধু আবদুল্লাহ নন! কী আশ্চর্য! মানুষের চেহারার এমন মিলও থাকে! আপনার চেহারা যে হুবহু আমার প্রিয় বন্ধু আবদুল্লাহরই মতো। যা হোক, বন্ধু ভেবে ভুল করে আপনার মাথায় চড় মেরে বসেছি। আমাকে ক্ষমা করে দেবেন।' লোকটা গজগজ করতে করতে চুপ হয়ে গেল। অর্থাৎ চড়ও মারা হল, আর নগদ হাজার টাকা আয়ও হল।

ঘণ্টাখানেক পার হয়েছে। বড়লোক বন্ধু এবার বলল, যদি আগের মতো আরেকটা জোর চড় কষতে পারিস আর উল্টো মার না খাস তবে পাঁচ হাজার টাকা। কথার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুটি লোকটার মাথায় বেদম জোরে আবার একটা জোর চড় মেরে বলে উঠল, 'আবদুল্লাহ! আমার সঙ্গে মশকরা? ভেবেছিস অন্ধকারের মধ্যে বসে আছিস বলে তোকে চিনতে পারি নি? আমি ঠিকই বুঝেছি বন্ধু, তুই আমার সেই প্রিয় বন্ধু আবদুল্লাহ ... হা হা হা। তা কেমন আছিস? ভাবি কেমন, ছেলেমেয়েরা?'

ঐ লোকের তখন তো প্রায় পাগলের মতো অবস্থা। সে হুঙ্কার দিয়ে উঠল। কী পেয়েছেন আপনি! 'বার বার আমাকে আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ বলছেন আর মাথায় চড় মেরে যাচ্ছেন। আমি কি আবদুল্লাহ নাকি? দেশটাকে মগের মুল্লুক পেয়েছেন!' ইত্যাদি ইত্যাদি। বিরাট বিস্ময়ে বন্ধু দুচোখ আকাশে তুলে বলল, সত্যিই আপনি আবদুল্লাহ নন? হায় আল্লাহ! কী অসীম তোমার ক্ষমতা! দুটো মানুষকে কীভাবে এমন হুবহু করে তৈরি

করতে পারলে? যাক, বন্ধু ভেবে আবারও আপনার মাথায় জোরে চড় কষেছি। আমাকে মাফ করে দেবেন।' লোকটা রাগে গজ গজ করতে করতে ঘুরে বসল। এভাবে দ্বিতীয়বারে পাঁচ হাজার টাকা হজম।

এদিকে সিনেমা শেষ হয়েছে। দোতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে তারা নামছে। হঠাৎ দেখে সামনে আবার সেই টাকমাথা লোকটা, একমনে সিঁড়ি দিয়ে নামছে। বড়লোক বন্ধু বলল, এবার কষতে পারলে পঁচিশ হাজার। বলতে না বলতেই গরিব বন্ধু হেসে কুটি কুটি হয়ে লোকটার টাকে প্রচণ্ড এক থাপ্পড় মেরে বলল, 'ভাই আবদুল্লাহ! তোকে ভেবে ভুল করে আমি সিনেমা হলে না একজনের মাথায় পর পর দুবার ...।' তার হাসি আর থামে না।

এখন আমার প্রশ্ন, এই যে আবদুল্লাহ লোকটি–আমাদের দেশে এই লোকটি কে? যার মাথায় কারণে-অকারণে চাটি মারা হয়? লোকটা হচ্ছে এ দেশের জনগণ। আর ঐ যে পেছনের বন্ধুরা–ওরা হল এদেশের যত রাষ্ট্রীয় দস্যু, দুর্বৃত্ত, দুর্নীতিবাজ। অল্প কিছু মুষ্টিমেয় অত্যাচারী দেশের জনগণকে এভাবেই থাপড়াচ্ছে আর নিরুপায় জনগণ অসহায়ের মতো হাত-পা ছুড়ে শুধু লাফাচ্ছে।

এই যে দুঃখপূর্ণ পরিস্থিতি, এটা কেন হচ্ছে? কারণ আমাদের রাষ্ট্রকাঠামো এখনো সংহত হয় নি। অন্যায়কারীকে ধরার কোনো ব্যবস্থাই নেই এখানে। তাই আমাদের চেষ্টা হওয়া উচিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা রচনা করা। আমি মনে করি, জাগরণের দিন আসছে। আজকে দেশে ছোট-বড় অনেক সংগঠন তৈরি হচ্ছে। হাজার হাজার সংগঠন। এর পথ ধরেই আসবে সে জাগরণ।

আগে হরতাল হত, ব্যবসায়ীরা গালে হাত দিয়ে বসে থাকত। কিছুই করতে পারত না। কিন্তু আজকের দিনে ব্যবসায়ীরা এবং তাদের সংগঠনগুলো অন্তত আগের চেয়ে শক্তিশালী হয়েছে। তারা প্রতিবাদ করছে। ১৫ বছর পর কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে এত সহজে হরতাল দেয়া, সারা দেশকে জিম্মি করা হয়ত অত সহজ হবে না। সংগঠন বড় হয়ে উঠছে মানে ব্যক্তি-মানুষের শক্তি বাড়ছে। সঙ্ঘবদ্ধতা বাড়ছে। এদেশে এখনও আমাদের অনেক দুঃখ-কষ্ট, তবু বাংলাদেশ অগ্রসর হচ্ছে। এটাই আজ আমাদের আশা।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পরাধীন থাকায় আমাদের মধ্যে একটা হীনম্মন্যতা বদ্ধমূল হয়ে আছে। বছর তিনেক আগে আমি কেমব্রিজে গিয়েছিলাম। সেখানে যে ছাত্রদের দেখেছি, আমার কাছে তাদের এমন কিছু অসাধারণ মনে হয় নি। মনে হল, আমি যখন ঢাকা কলেজে পড়াতাম, সেখানে দেশের সেই সেরা কলেজে আমি এর চেয়ে উন্নতমানের না হলেও খারাপ ছাত্র দেখি নি। তবুও সেসব ছাত্রদের চেয়ে কেমব্রিজের ছাত্রদের মান ওপরে উঠে যায়। কারণ সেখানকার পড়াশোনার উন্নতমান, সুযোগ-সুবিধা ও শৃঙ্খলা।

তাই জাতি হিশেবে আমরা আরও একটু সুশৃঙ্খলা, সুবিন্যস্ত ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারলে, অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করাই হয়ত আমাদের পক্ষে সম্ভব হত। এর অন্তত একটা কারণ, আমাদের মেধা পৃথিবীর যে-কোনো শ্রেষ্ঠ জাতির মেধার সমকক্ষ। আর আমাদের রয়েছে অসীম সম্ভাবনা। আমাদের দেশে অতি সাধারণ মানুষের, এমনকি রিকশাওয়ালা বা মুটে মজুরদের কথাতেও অনেকসময় এমন বড় আর সম্পন্ন জীবনদর্শন দেখেছি, যা দেখে অবাক হয়েছি। প্রায় কোনো জায়গাতেই আমাদের কমতি নেই। এখন চাই শুধু শৃঙ্খলা, সুচিন্তিত পরিকল্পনা আর সুযোগ–যার অন্য নাম সংগঠন।

এই যে আজ বিকেলে এ স্কুলের ছাত্ররা গ্রাউন্ড অলিম্পিয়ানে প্যারেড করল, সেটা তো তারা একটা সুন্দর সুযোগের মধ্যে আসতে পেরেছে বলেই। এর ফলে পড়াশোনার পাশাপাশি সব দিকেই তারা দুর্জয় হয়ে উঠছে। ওদের এ পারফরম্যান্স অবশ্য আমি আগেও দেখেছি ভিডিওতে, এ এককথায় মুগ্ধ হওয়ার মতো। অন্যান্য স্কুলের ছাত্ররা কুচকাওয়াজ করতে করতে একের পর এক আসছে, মনে হচ্ছে যেন হেলেদুলে রাজা বাহাদুরের দল হেঁটে আসছে। একেবারেই এলোমেলো প্যারেড!

কিন্তু অন্যান্য স্কুলের পর যখন এ স্কুলকে দেখাল, মনে হল একটা টর্নেডো এসে যেন সব আবর্জনা উড়িয়ে নিয়ে গেল। কী চৌকস প্যারেড! পুলিশ বা সেনাবাহিনীর প্যারেডের চেয়েও যেন ঝকঝকে। আসলে এটাই হয়। মানুষকে একটা সুপরিকল্পনার মধ্য দিয়ে, সুশৃঙ্খলভাবে প্রশিক্ষণের সুযোগ দিলে তার বিকাশটা এমনি পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তখন সে হয়ে ওঠে রীতিমতো অজেয়।

পৃথিবীর যে-কোনো মানুষ চাইলেই এমনি বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যেই কম হোক বেশি হোক, একটা সম্ভাবনার আগুন রয়েছে। সেই মানুষই আলোকিত–যার ভেতরে এই আগুনটা জ্বলছে। পৃথিবীর সবচেয়ে নির্বোধ মানুষটির মধ্যেও কিন্তু কোনো না কোনো জায়গায় রয়েছে কিছু না কিছু অসাধারণত্ব। মানুষের মেধা বা প্রতিভা বাবার টাকা থেকে আসে না। এ আসে প্রকৃতি থেকে।

সুতরাং এ জিনিশ সবার মধ্যেই আছে। একে একটু লালন করতে হয়। একে একটু মুক্তি দিতে হয়, ব্যবহারের মধ্যে আনতে হয়। তাহলেই এ জ্বলে ওঠে। এই মেধাকে যদি যত্ন দিয়ে, চর্চা দিয়ে, বিকাশের সুযোগ দিয়ে, উজ্জ্বল করে তোলা যায়, তাহলে দেখা যাবে প্রত্যেক মানুষই একেকটা অন্তহীন সম্ভাবনার বিশ্ব হয়ে উঠেছে।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন এখানে এই দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে পুরোপুরি সুবিধাবঞ্চিত আদিবাসী ছেলেমেয়েদের নিয়ে এই যে অসাধারণ কাজটি করছে, এজন্য তাঁদের আমি আন্তরিক সাধুবাদ জানাই। প্রত্যাশা করি, তাঁদের এ কাজ সময়ের সাথে সাথে আরও পরিপূর্ণতা ও সমৃদ্ধি পাবে।

স্বপ্নের সম্ভাবনা

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন যে কথাটা বহুদিন ধরে বলে যাচ্ছে, তা হল : মানুষ নিজেকে বিশ্বাস করলে সে একদিন অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। ম্যাথু আর্নল্ডের একটা কবিতা আছে–*দ্য স্কলার-জিপসি*। সেই কবিতাটা এক তরুণকে নিয়ে লেখা।

তরুণটি অক্সফোর্ডে ম্যাথু আর্নল্ডের সঙ্গে পড়তেন। ছাত্র হিশেবেও ছিলেন বেশ ভালো। কিন্তু নগর জীবনের জটিলতায় হাঁপিয়ে উঠে একদিন হঠাৎ জিপসি হয়ে যাযাবর জীবনের ভেতর চলে গেলেন। আমাদের এই ঊর্ধ্বশ্বাস যন্ত্র-সভ্যতার দুঃসহতার বর্ণনা দিতে গিয়ে সেই কবিতার এক জায়গায় আর্নল্ড লিখেছেন, We never deeply felt, nor clearly will'd. অর্থাৎ আমরা এই সভ্যতার মানুষেরা আজ না করছি কোনোকিছুকে গাঢ়ভাবে অনুভব, না করছি গভীরভাবে বিশ্বাস। আর্নল্ড বিষণ্ন হয়েছেন এই ভেবে যে, আজকের সভ্যতার কাছে মানুষের বড় কিছু পাওয়াই যেন আর সম্ভব নয়।

গল্পটির সারমর্ম একটাই : বড় কিছু পেতে হলে গোটা বিশ্বাসকে একত্রিত করে একমনে তাকে চাইতে হবে। যেভাবে গৌতম বুদ্ধ সত্যকে চেয়েছিলেন, যযাতি যৌবনকে চেয়েছিলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যেভাবে আমরা সবাই রক্তের ভেতর বলেছিলাম, *তোমাকে আসতেই হবে হে স্বাধীনতা*–সেভাবে।

লামাতে এসে শুনলাম, এই মাঠ নিয়ে কোয়ান্টাম সদস্যদের মধ্যে একটা স্বপ্ন জন্মেছে। স্বপ্নটা বড়। প্রত্যেকের আকুতি : এখান থেকে

কোয়ান্টামমের গ্রাউন্ড অলিম্পিয়ান উদ্বোধনকালে প্রদত্ত বক্তব্য, ২৬ নভেম্বর ২০১০

খেলাধুলা ও অনুশীলন করে ছাত্রছাত্রীরা একদিন না একদিন অলিম্পিকের স্বর্ণপদক ছিনিয়ে আনবেই। আমি মনে করি–এই বিশ্বাস যদি সবার মধ্যে সত্যিকারভাবে জন্মে থাকে, তবে তার শক্তিতে আজ হোক কাল হোক একদিন এই মাঠ ওই স্বর্ণপদক আনবেই। পারবে এজন্য যে, আমরা যা বিশ্বাস করতে পারি, আমরা তা অর্জনও করি।

আমরা যদি কোনোকিছু করতে ব্যর্থ হই, তবে বুঝতে হবে, আমরা কাজটা যে পারবই তা সত্যিকারভাবে ভাবতে পারি নি। মানুষের পক্ষে যা-কিছু বিশ্বাস করা সম্ভব, বাস্তবে তা করাও সম্ভব। ইংরেজি ভাষায় একটা কথা আছে, তা হল : 'অসম্ভব' শব্দটা ডিকশনারিতে আছে, বাস্তবে নেই। যেমন ধরুন, যদি কেউ বলে ২৮ বছর বয়সে অর্ধেক পৃথিবীর সম্রাট হওয়া যায়, তবে কথাটা খুব অবিশ্বাস্য শোনাবে। কিন্তু আলেকজান্ডার তা হয়েছিলেন। এই যে বড় কিছুতে বিশ্বাস করতে পারা, বড় স্বপ্নে জেগে উঠতে পারা এজন্যই গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে ঢোকার মুখেই আমরা তাই লিখে রেখেছি : 'মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড়'। আবারও বলি : মানুষ নিজেকে যা ভাবতে পারে, মানুষ তা-ই শুধু হয় না, হয় বলে একসময় তা করতেও পারে। তাই আমার বিশ্বাস, যদি স্বপ্ন দেখা এভাবে চলতে থাকে তবে এই মাঠ থেকে একদিন না একদিন অলিম্পিকের গোল্ড মেডেল আসবেই। শুধু একবার না, বার বার আসবে।

এই স্কুলের ছেলেমেয়েদের দেখে খুবই আশা জাগে। যখন পর্দায় তাদের প্যারেড দেখছিলাম, মনে হচ্ছিল পুলিশ কিংবা সেনাবাহিনীর চেয়ে এরা যেন কম নয়। সত্যি যদি একজন মানুষকে বড় স্বপ্ন দিয়ে, প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলা যায় তবে তাকে দিয়ে পৃথিবীর সব অবিশ্বাস্য কাজই করিয়ে নেয়া যায়। সে তখন হয়ে ওঠে দুর্জয়।

এই যে হাত, এ দিয়ে যদি আমি ইটের ওপরে জোরে ঘা দিই, তবে কী হবে? হয়ত হাতটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে চারপাশে ছড়িয়ে পড়বে। অথচ এই হাত দিয়েই তো কোনো কোনো মানুষ তিনটা, চারটা এমনকি তারও বেশি পাঁজা করা ইটের ওপর আঘাত করে সেগুলোকে ভেঙে ফেলে। যখন ভাঙে তখন সে হাত কীসের হাত হয়ে যায়? এ কি মানুষের হাত থাকে? এ তো হয়ে যায় ইস্পাতের হাত।

কখন এমন হয়? নিজের পুরো সত্তাকে যখন ওই হাতের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে সংহত করা যায়, কেবল তখনই। আর সেই ইস্পাত যখন ইটের ওপর আঘাত করবে তখন ইট তো ইট, এর চেয়ে অনেক শক্ত জিনিশও গুঁড়ো হয়ে যাবে। মানুষের মনের এই ক্ষমতা আছে। যে স্বপ্ন এই মাঠ থেকে আজ জেগেছে, এই স্বপ্নকে যদি হৃদয়ে জ্বালিয়ে রাখা যায় তবে একদিন তা বাস্তব হবেই।

কাজ, বিশ্বাস ও ইতিবাচকতা

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সদস্যদের সবাইকে শুভেচ্ছা। একটু আগে অনুষ্ঠানের আয়োজক বেশ আনন্দের সাথেই বলছিলেন, 'অল্প সময়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন আমরা বেশ ভালোই করতে পেরেছি। তাকিয়ে দেখুন, হলরুম লোকে-লোকারণ্য।' কথাটা যখন তিনি ঘোষণা করছিলেন তখন আমার অবস্থা যে কী করুণ হয়ে পড়ছিল, তা কি তিনি বুঝতে পারছিলেন?

ঘরভর্তি এই যে হাজারখানেক মানুষ প্রত্যেকে তাদের দ্বিগুণ সংখ্যক চক্ষু নিয়ে এ মুহূর্তে আমাকে প্রায় গিলছেন, তারপরও যে আমি আছি এবং বেঁচে আছি, তার ওপর শুধু সামনে নয়, পেছন দিকেও একই অবস্থা (দু-হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে পেছনে–দর্শকসারিতে স্থান না হওয়ায় মঞ্চের পেছন দিকে বসা শ্রোতাদের দিকে ইশারা করে), ওরাও হয়ত নজর রাখছেন আমার ওপর, হয়ত দেখছেন উল্টোপাল্টা কিছু বলছি কিনা। আমাদের দেশে ডেমোক্রেসি ওয়াচ নামে একটা সংগঠন আছে। এঁরা সেই ডেমোক্রেসি ওয়াচ নন, এঁরা হলেন কোয়ান্টাম ওয়াচ! এত মানুষের সামনে কথা বলা খুবই আতঙ্কের বিষয়।

কিছুক্ষণ আগে আমাকে আভাস দেয়া হয়েছে আজ ইতিবাচকতা নিয়ে আমাকে কিছু বলতে হবে। আয়োজকদের ভাষায় বিষয়টা হল : ইতিবাচকতায় জয়, নেতিবাচকতায় লয়।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম সেন্টার আয়োজিত মুক্ত আলোচনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য, ১২ নভেম্বর ২০১৪

এখানে আমার একটা কথা আছে। আমরা যারা শিক্ষক, ছাত্রদের শেখানোর সময় আমরা একটা পদ্ধতি মেনে চলি। সেটা হল, ছাত্রদের শেখানোর সময় তাদের সামনে ভুল বা অশুদ্ধ কিছু একদম বলি না। তা করলে অল্প পরিমাণে হলেও ভুলটা ছাত্রের মাথায় থেকে যায়। একটা উদাহরণ দিই।

বহু ছাত্রছাত্রী পরীক্ষার খাতায় 'অদ্ভুত' বানানটা লেখার সময় দয় ভ-য়ের সঙ্গে দীর্ঘ ঊ-কার দিয়ে বসে। এটা আসলে হ্রস্ব উ-কার। এখন আমি যদি বানানটা কাউকে শেখাতে বসে বার বার বলতে থাকি, বুঝেছ হে, দয় ভ-য়ের সঙ্গে কিন্তু দীর্ঘ ঊ-কার নয়, হবে হ্রস্ব উ-কার। এটা 'অদ্ভূত' নয়, অদ্ভুত। তবে বার বার শোনার ফলে শুদ্ধটার পাশাপাশি ভুলটাও মনের অগোচরে তার কানের পাশে কমবেশি লেগে থাকবে। এর ফলে পরীক্ষার সময় তাড়াহুড়ায় অনেকে হ্রস্ব উ-কার লিখতে গিয়ে ভুল করে দীর্ঘ ঊ-কারও লিখে বসতে পারে।

তাই ভুলটা বলা ঠিক না। ওই ভুল অনেকসময় সবকিছুকেই ভুল বানিয়ে ফেলে। যা ভুল বা মিথ্যা, তার আবার বলাবলি কী? ও তো মিথ্যাই। ও পড়ে থাক নিজের মিথ্যার ভেতর। আজ তাই নেতিবাচকতায় লয় নিয়ে কিছু বলব না, বলব শুধু ইতিবাচকতায় জয় নিয়ে।

বলার মতো কোনো প্রস্তুতি আজ আমার নেই। ছুটতে ছুটতে এসেছি লামা থেকে। আসতেই ধরিয়ে দেওয়া হল বিষয়টা। সেইসঙ্গে শুরু হয়ে গেল এই অনুষ্ঠান। ঘরে ঢোকার আগে হুড়মুড় করে কিছু কথা মনে এসেছিল, এত মানুষ দেখে ভড়কে গিয়ে সেসবও ভুলে গেছি। কোয়ান্টামের কাজ-কারবারই আলাদা। এদের অনুষ্ঠান ২৫/৩০ জনে হয় না। হাজার লাখ লাগে। কাজেই আমার করুণ অবস্থাটা বুঝতেই পারছেন। তবু ভেঙে পড়ারও কিছু নেই। মানুষের কিছুই যখন থাকে না তখনও থাকে একটা জিনিশ : মুক্তি। সেই স্বাধীনতা নিয়ে আজ আপনাদের কিছুক্ষণের সুখশান্তিকে অন্তত কয়লা করে দিতে পারব ইনশাল্লাহ। ভালো লাগলে শুনবেন, না লাগলে ঘরটায় দরজা আছে, জানালা আছে, সিঁড়ি আছে—যার যেদিক দিয়ে খুশি সটকে পড়বেন।

দেখুন, আমরা বাঙালিরা সব ব্যাপারে কেন যেন অযথাই নেতিবাচক হতে ভালোবাসি। (দেখলেন তো আবার সেই 'নেতিবাচক' শব্দটা এসে

পড়েছে। বুঝতেই পারছেন মানুষের ওপর নেতিবাচকতার জোর কতটা প্রবল!) ব্যাপারটা খোলাসা করতে একটা গল্প বলি। গল্পটা একবার আমার এক টেলিভিশন অনুষ্ঠানে দেখিয়েছিলাম। সেটা এরকম : এক ভদ্রলোক ব্যবসায়িক স্বার্থ হাসিলের মতলবে এক বড় কর্মকর্তাকে বাসায় দাওয়াত দিয়েছে। বিরাট আয়োজন। সেই কর্মকর্তা যদি সন্তুষ্ট হন তো তিনি কোটি টাকার মালিক হয়ে যাবেন। বড় কর্মকর্তাও প্রাণভরে খাওয়াদাওয়া করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই তিনিও খুবই উৎফুল্ল ও তৃপ্ত। ঘি-পোলাও যে পরিমাণ পেটের মধ্যে ঢুকেছে, তার ফলে তার চোখ-মুখ থেকে যে উজ্জ্বল দীপ্তি বেরোচ্ছে, তা তার চেহারাকে আরও জেল্লাদার করে দিয়েছে।

খাবার পর বিদায় নেওয়ার পালা। উন্নত দেশের মানুষেরা এসময় কী করে? আমি সবসময় দেখেছি, পার্টি শেষে অতিথিরা বলেন, কী চমৎকার সময় কাটল! কী অসম্ভব ভালো! কী অপূর্ব আয়োজন, অসাধারণ রান্না– এমনি সব কথা। সেখানে আমাদের দেশে শুরু হয় কেবলই সব অপয়া কথাবার্তা। যিনি খেয়েছেন, খাবার জোশে-তৃপ্তিতে-জেল্লায় দপ দপ করছেন, তাঁকেও গৃহস্বামী কাঁচুমাচু হয়ে বলবেন–'বড় কষ্ট করে গেলেন স্যার'। হ্যাঁ, কষ্ট তো তিনি করেছেনই। এত দামি, লোভনীয় সব খাবার সাবাড় করা, এত কোর্মা রেজালা বিরিয়ানি বোরহানি পেটে চালান করা– এসব কি কম কষ্টের কথা! তবে সেই ভদ্রলোকও কম ঘড়েল নন। যে গৃহস্বামী তাঁকে খাইয়ে কোটি টাকা আয় নিশ্চিত করার আনন্দে এখন ঢেঁকুর তুলছেন, তার কথার উত্তরে তিনিও বলবেন, 'না না, কষ্ট আমি আর কী করলাম সাহেব, ও তো করলেন আপনি! এত কেনাকাটা, রান্নাবাড়া ...।'

আমাদের দেশ তাই শেষপর্যন্ত একটা কষ্টাকষ্টির দেশ। এখানে সবাই শুধু কষ্ট করে। সবাই সবাইকে শুধু কষ্ট দেয়। কেউ কাউকে আনন্দ বা স্বস্তি দেয় না। কারো কাছ থেকে কেউ তৃপ্তি বা সুখ পায় না। এভাবেই চলছে। আসলে এর উল্টোটাই কি হওয়া উচিত নয়?

দুজনেরই এ সময়ে ফুর্তি আর খোশমেজাজে থাকার কথা কি ছিল না? এ সময় দুজনেরই কি বলা উচিত নয় যে, 'আমরা দুজনেই খুব খুশি, কী বলেন! দুজনেই আমরা খুব ভালো আছি।' এই তো স্বাভাবিক!

সময়টা উপভোগ করতে পারার আনন্দের জন্য একে অপরকে অভিনন্দন জানাবে, এটাই তো প্রত্যাশা। এটা হলে সবাই মিলে একটা ভালোলাগার মধ্যে বাস করা হবে। তাদের ফুর্তি আরও রমরমা হবে। কিন্তু আমাদের এটা হয় না কেন? অন্যকে প্রশংসা বা অভিনন্দনের উদারতা দেখালে আমাদের জীবন তো আরও আনন্দময় হয়। সকলের কাছে সকলের কৃতজ্ঞতা আরও বাড়ে। এই তো হওয়া উচিত।

এখন প্রশ্ন, আমরা সবসময় কেন উল্টোটা করি? অন্যের এতটুকু খারাপ দেখলে কেন এত খুশি হই : 'মরেছে মরেছে, খুব তো বেড়েছিল, এখন দেখলি কেমন চাপড়টা খেল'। আমরা কেন সবসময় সবকিছু ধ্বংস করে ফেলতে চাই? নতুন কিছু জন্মাবে, বিকশিত হবে, বড় হবে–এতে আমরা কেন খুশি নই?

আল মাহমুদ তাঁর একটা কবিতার মধ্যে লিখেছেন–*পুনর্জন্ম নেই আর, জন্মের বিরুদ্ধে সবাই*। আমরা জন্মকে কেন কেবল রুদ্ধ করে দিতে চাই? নতুন কিছু আসবে, সবাই মিলে আমরা সুখী হব, আমাদের জীবন একটা নতুন আলো জন্ম দেবে, এতে কেন আমরা খুশি না? কেন কেউ কিছু ভালো করলে সঙ্গে সঙ্গে তার সমালোচনায় আমরা উঠে পড়ে লাগি? পাশের বাড়ির লোক রুই মাছ খেলে ভেতরে ভেতরে গজরাই : জানি জানি কোথা থেকে আসে, যেদিন ধরিয়ে দেব ... ইত্যাদি। আরে বাবা, ভালো হোক খারাপ হোক, ও তো ওটা রোজগার করেছে। তুইও কর। খারাপ পথে না করতে চাইলে ভালো পথে কর। তুইও সুখে থাক। কিন্তু ওকে নিয়ে তোর এত কষ্ট কেন?

যতটুকু বুঝি এর কারণ, নিজের ব্যর্থতার তীব্র অনুভূতি। এদেশের অধিকাংশ মানুষ জীবনে ব্যর্থ হয় নানাভাবে। কেন ব্যর্থ হয়? আমার ধারণা, কাজ করে না বলে। সফল হতে গেলে মানুষকে কাজ করতে হয়। যে কাজ করবে না, সে তো ব্যর্থ হবেই। আর ব্যর্থ হলে মানুষ কী করে, তা তো সবাই জানেন। অন্যেরা যাতে সফল হতে না পারে, সেজন্য পুরো জীবনীশক্তি ক্ষয় করে প্রাণপণে চেষ্টা করে। তাকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত তখন তার শান্তি নেই। আমি যা হতে পারি নি, অন্যকে তা পারতে দিই কী করে? আমিই যে তাহলে থাকি না।

এ কারণেই আমাদের দেশে ইতিবাচক মানুষের সংখ্যা এত কম।

ব্যর্থ মানুষের ভয় নেই; কিন্তু সফল মানুষের আছে। তাই যিনি সফল হন তিনি সবসময় ঝুঁকিতে থাকেন। তার ভয়, কখন তার এই সফলতাটুকু লুট হয়ে যায়। আমাদের অধিকাংশ মানুষের মধ্যে এই ব্যর্থতা বা সহিংসতার কারণ কী? আমি আমার বিভিন্ন লেখায় এর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি।

আমার মনে হয়েছে, এর কারণ আমাদের জাতিগত স্বাস্থ্যহীনতা। এর অনেকটাই জন্মগত, কিছুটা পরিবেশগত বা ঐতিহাসিক। ভালো করে তাকালেই আমরা বুঝব : শতকরা ৯০ জন বাঙালির শারীরিক উপযুক্ততা নেই। আমাদের গড়পড়তা স্বাস্থ্য ভালো নয়, তাই একটু কঠিন কাজ হলেই আমরা আর পেরে উঠি না। 'পেরে উঠি না' বলব না। পারি। চাবকানির সামনে পড়লে পারি। মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমিতে জলন্ত সূর্যের নিচে দাসসুলভ পরিস্থিতিতে পারি কিন্তু সহজাত আনন্দে বা ফুর্তিতে পারি না। অনেকে বলে, লোকটা অলস, কাজ করে না। আসলে সে অলস না, অক্ষম। নির্জীব। সে স্বাস্থ্যের অনটনে ভুগছে। তাই পেরে উঠছে না। কাজ করতে যে শারীরিক শক্তি লাগে, উদ্যম লাগে, সেই শক্তি তার মধ্যে নেই। তাই পারে না।

স্বাস্থ্যজনিত এই দুর্বলতার কারণে আমরা দুর্বার শক্তি নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি না। জীবনকে আক্রমণ করি না। আমরা শুধু স্বপ্ন দেখি। রাতে তো দেখিই, দিনেও দেখি। আমার কাছে মাঝে মাঝে অনেক ছেলেমেয়ে আসে। নানা স্বপ্ন তাদের মধ্যে। বলে, স্যার, যদি পারতাম মানে যদি সম্ভব হত, মানে সবার সাহায্য-সহযোগিতা, মানে পৃষ্ঠপোষকতা, মানে–এভাবে। শুধু 'মানে মানে' করে। ভাবটা এমন যেন কিছু একটা পেলেই পৃথিবীটা জয় করে ফেলত। কিন্তু কী করত বুঝতে পারে না। শুধু মুখে বলে তা না, আবেগে উত্তেজনায় আকাশের দিকে দু-হাত ছুড়তে ছুড়তেও বলতে থাকে।

আমি ওদের বলি, কোনো কাজ করতে গেলে তো এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত হলে শুধু হয় না। এর জন্য তো কাজ করতে হয়। কোনো আলেকজান্ডার যদি অর্ধেক বিশ্ব জয় করার কথা ভাবেনই, তাহলে তাকে তো মেসিডোনিয়ায় বসে শুধু লেজ নাড়লে চলবে না। তাকে তো বিশ্বজয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। হাজার হাজার দক্ষ সৈন্য নিয়ে

দেশের পর দেশ আক্রমণ করতে হবে। শত্রুকে পরাস্ত করতে হবে। পদানত করতে হবে। তার মধ্যে যে দুর্জয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে তা নিয়ে ঝাঁপ দিতে হবে। জয়ের পথ তো এটাই।

আমাদের মধ্যে সেই আক্রমণ কোথায়? শুধু আকাশের দিকে হাত-পা ছুড়ে কি কাজ হবে? পাশব আক্রমণে জীবনের ওপর অন্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়াকে আমরা কখনোই জীবনের ঈশ্বর বানাই না। শুধু নানা কল্পিত সাফল্যের স্বপ্নে উদ্বাহু হয়ে আকাশের দিকে হাত-পা ছুড়ি। জানি অদম্য শক্তি আমাদের অধিকাংশের মধ্যে নেই। ঠিক আছে, কিন্তু খারাপ স্বাস্থ্যই যদি আমাদের এই দুঃখপূর্ণ নিয়তির কারণ হয় তবে সে স্বাস্থ্যকে নিজেদের চেষ্টায় তো ভালোও করা যায়। এর জন্য শ্রম যত্ন চেষ্টা করাও তো সম্ভব। নিয়মিত শরীরচর্চা করে এর উন্নতি ঘটানো তো অন্তত করা চলে। সুষম খাবার আর সুশৃঙ্খল জীবনচর্চা দিয়ে নিজের স্বাস্থ্যগত সক্ষমতা আর সক্রিয়তাকে বাড়িয়ে তোলা যায়। কিন্তু আমরা এসব করি না, শুধু আকাশের দিকে দু-হাত নেড়ে 'মানে মানে' করি।

এই যে লামায় গিয়েছিলাম, সেখানে দেখলাম অক্লান্তভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে ছেলেমেয়েদেরকে শারীরিকভাবে আরও দৃঢ়, সহিষ্ণু আর উদ্যমী করে তোলার জন্য। যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মানুষের শরীর মজবুত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু সে বসতে পেলে শুতে চাইবেই। কারণ বসে থাকতেও কিছুটা শক্তির দরকার হয়, যা তার নেই। আর শরীরে-মনে শক্তি বা উদ্যম থাকলে সে বসতে পেলেও দৌড়াতে চাইবে। এই যে এতটুকু পার্থক্য, এই ব্যবধান কিন্তু বিরাট। এ ব্যবধান শ্রেষ্ঠ আর নিকৃষ্টের ব্যবধান। যখন কোনো মানুষ এই শক্তি আর বিশ্বাস অর্জন করতে পারে তখনই বুঝতে হবে সে ইতিবাচক হয়ে উঠেছে।

আমাদের বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের পাঠচক্রে ছোটখাটো একটি লাজুক মেয়ে ছিল। দেখে মনে হত খুবই সাধারণ। হয়ত সাধারণই ছিল সে। কিন্তু আমাদের স্কুল পর্যায়ের বই পড়া কর্মসূচিতে সে যুক্ত ছিল। এখানে একটা আশ্চর্য বই পড়েছিল সে। বইটা জুলভার্নের *অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেজ*। ৮০ দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ বা বিশ্বভ্রমণ। বইটাতে ও পড়েছিল কী করে এর নায়ক ফিলিয়াস ফগ কত বিপদ জয় করে মাত্র ৮০ দিনে বিশ্বভ্রমণ করে ফিরে এসেছিলেন। পথে কত বাধাবিপত্তি, কত

সংকট, বিপদ, দুর্ঘটনা! সব উৎরে মাত্র ৮০ দিনেই এই অসাধ্য তিনি সাধন করেন।

বইটা মেয়েটাকে জ্বালিয়ে তুলেছিল। দেশে তখন এভারেস্ট অভিযানের তোড়জোড় চলছে। মেয়েটার মনে হয়েছিল, এত কষ্ট দুঃখ আর বাধা-বিপত্তির পরও ফিলিয়াস ফগ যদি সফল হতে পারেন, তাহলে আমি কেন চেষ্টা করলে একদিন এভারেস্টের চূড়ায় উঠতে পারব না?

এর পরেই শুরু হল তার চেষ্টা। একসময় সে সত্যি সত্যি এভারেস্টের চূড়ায় গিয়ে উঠল। দেখুন স্বপ্নের কী শক্তি! আপনারা সবাই মেয়েটির নাম জানেন। নিশাত মজুমদার। বাংলাদেশের প্রথম এভারেস্ট বিজয়ী নারী। বলে না দিলে কে বিশ্বাস করবে যে, এই ছোটখাটো দুর্বল গড়নের লাজুক মেয়েটি এভারেস্টের চূড়ায় উঠেছিল। দেখুন মানুষের উদ্যম, স্বপ্ন আর আত্মবিশ্বাসের কী ক্ষমতা! পৃথিবীর দুর্ভেদ্যতম দেয়ালকেও সে ভেঙে ফেলতে পারে। ওর আগে এভারেস্টে এ দেশের উঠেছিল মাত্র একজন–মুহিত। মুহিতেরও যাত্রার আগের একটা ঘটনা এখনও মনে পড়ে।

সেদিন একটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা ওর হাতে বাংলাদেশের পতাকা তুলে দিচ্ছিলাম। বক্তৃতার সময় দেখলাম ওর চেহারা বিমর্ষ। মনে হল, কিছুটা যেন ভয়-পাওয়া। তেমনি বিমর্ষ গলাতেই ও সবাইকে বলল, আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন। ওকে বললাম, দেখ মুহিত, এভারেস্টের চূড়ায় উঠতে গিয়ে পৃথিবীতে মরে কয়জন? সব মানুষই তো মরে বিছানায়। কই, বিছানায় যাওয়ার আগে তো প্রতিদিন সবাইকে ডেকে বলে না, আমি বিছানায় শুতে যাচ্ছি, আমাকে দোয়া করবেন। তাহলে যাত্রার মুহূর্তে তোমার গলা কেন বিষণ্ন? পর্বতে উঠতে চাইলে চূড়ার দিকে তাকাও, নিচের দিকে নয়। আপনারা জানেন কাজটা ও পেরেছিল। এভারেস্ট জয় করেছিল।

কেন এরা কাজটা পেরেছে? কারণ তাদের ভেতরে একটা তীব্র স্বপ্ন ছিল, সেটা হল : আমি পারব। ছিল একটা দুর্জয় আত্মবিশ্বাস : আমি পারবই। আই মাস্ট গো টু দ্য টপ। এই স্বপ্নই তাদের ওখানে নিয়ে গেছে। আমাদের সবার বুকের মধ্যে অমনি একটা করে পর্বত আছে। আমাদের স্বপ্ন হওয়া উচিত–ঐ চূড়াকে জয় করব। ওর শীর্ষে উঠব।

তাহলেই জীবনের সার্থকতা। আমাদের যাত্রা যেন হয় ঐ শিখরের দিকে। বহু মানুষ স্বপ্ন দেখে। কিন্তু সবার স্বপ্ন সফল হয় না। আমি স্বপ্ন দেখলাম আর শুয়ে শুয়ে লেজ নাড়লাম, সে স্বপ্ন কি সফল হবে? স্বপ্ন মানে হচ্ছে লক্ষ্য, গন্তব্য। আমি কোথায় যেতে চাই, কোন চূড়ায় উঠতে চাই, তারই নাম। এই স্বপ্ন দেখা শুরু হল মানে ওই গন্তব্যে এগিয়ে যাবার সূচনা হল। এরপর কাজ। আসলে স্বপ্ন বলে আলাদা কিছু নেই। স্বপ্নের জন্য আমরা যতটুকু কাজ করি, তা-ই আমাদের স্বপ্ন।

আমরা নিজেদের স্বপ্নের জন্য কি ওই কাজগুলো করি? না করলে সাফল্য আসবে কী করে? আপনি যখন দোকানে যান, একটা সাধারণ মানের শাড়ির জন্য কত টাকা দেন? তিন শ, চার শ, পাঁচ শ, বড়জোর হাজার। কিন্তু দামি কোনো শাড়ির জন্য? হাজার এমনকি কয়েক লাখও হতে পারে। অর্থাৎ জিনিশ যত বড় চাইবেন দাম তত বেশি দিতে হবে। দেব তিন শ টাকা, আর চাইব তিন লক্ষ টাকার জিনিশ, তা কি হবে? বসে বসে স্বপ্ন দেখব, কিন্তু তার জন্য শ্রম স্বেদ রক্ত কিছুই দেব না–সেই স্বপ্ন কি কোনোদিন বাস্তব হবে? তাই চাই কাজ। কাজ এক আশ্চর্য জিনিশ! কাজ রাস্তার আবর্জনার মতো নেতিবাচকতাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দেয়।

একটা গল্প বলি। ডেল কার্নেগির বইয়ে পড়েছিলাম গল্পটা। এক ভদ্রলোকের একটা ছেলে হঠাৎ এক অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় মারা যায়। ভদ্রলোক কিছুতেই এই নিদারুণ মৃত্যুশোক সহ্য করতে পারছিলেন না। দুঃসহ যন্ত্রণায় তার মর্মান্তিক দিন কাটছে। খাওয়াদাওয়া, ঘুম, কাজকর্ম সব স্তব্ধ। জীবনকে মনে হচ্ছে দুর্বহ বিপর্যস্ত। এ কষ্টের ভার বহন করা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। শরীর-মন পুরো ভেঙে গেছে।

তার ছিল এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলেটি মারা গেলেও মেয়েটি তখনও বেঁচে আছে। একদিন সে আবদার করে বসল–বাবা, আমাকে একটা কাঠের নৌকা বানিয়ে দেবে? ছোট্ট মেয়েকে খুশি করতে তিনি একটানা কয়েক ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রমে কাঠ দিয়ে একটা নৌকা বানালেন। নৌকাটা মেয়েটার হাতে তুলে দিতে গিয়েই তার মনে হল, ছেলে মারা যাওয়ার পর নৌকা বানানোর মাত্র এই কটা ঘণ্টাই তিনি পুত্রশোকের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত ছিলেন।

কেন তিনি এ সময়টা পুত্রশোকের দুঃখ অনুভব করলেন না? কারণ খুঁজতে গিয়ে টের পেলেন ছেলের মৃত্যুর পর এই প্রথম তিনি ছেলেটার সম্পর্কে কিছু ভাবার সময় পান নি। তখন তিনি বুঝলেন, কাজ জিনিশটা এমনই। কোনো কাজ করার সময় কারো পক্ষে অন্য কোনোকিছু ভাবা সম্ভব নয়। নৌকা তৈরি করার সময় তিনি ছিলেন ঐ কাজটার মধ্যে পুরোপুরি ডুবে যাওয়া মানুষ, তাই সন্তান হারানোর শোকও তিনি তখন অনুভব করতে পারেন নি। ব্যস, তিনি যন্ত্রণা থেকে মুক্তির পথ পেয়ে গেলেন। তখন তিনি ঠিক করলেন, তিনি একের পর এক কাজ করে যাবেন। যতক্ষণ কাজ ততক্ষণই শান্তি। তিনি মন দিয়ে কাজ করতে লাগলেন। করতে করতে একসময় পুত্রশোক কাটিয়ে উঠলেন।

কাজ এভাবেই মানুষকে বাঁচায়। কাজ দিয়েই আমরা দুঃখকে অতিক্রম করি, দুর্ভাগ্যকে জয় করি। যে যত বেশি কাজ করে সে তত হতাশামুক্ত, দুঃখ-যন্ত্রণাহীন, আনন্দপূর্ণ।

প্রতিটা কাজই আমাদের জীবনে কমবেশি সাফল্য নিয়ে আসে। সাফল্য মানেই আনন্দ। তাই কাজ মানেও আনন্দ। একজন মানুষ যত কাজ করবে তত তার জীবনে আনন্দ বাড়বে। তত সাফল্য আসবে। জীবনকে কাজে ভরে দিতে পারলে পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার সময় কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকবে না। রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর আগে লিখে গেছেন–হে ঈশ্বর, সামনে শান্তির সমুদ্র। আমার জীবন তরণী ভাসিয়ে দাও। আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। লক্ষ লক্ষ আনন্দের সাগরে ভাসতে ভাসতে পরিপূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে তাই তিনি চলে যেতে পেরেছেন। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, 'আমি এক জীবনে দুই জীবনের কাজ করে গেলাম।' মৃত্যুর সামনে এই মানুষের কেন দুঃখ থাকবে?

কিন্তু আমরা কি এভাবে বলতে পারি? কেন পারি না? কারণ আমরা গাফেল। আলস্যে অবহেলায় জীবনকে কেবলই ফাঁকি দিয়েছি। আমরা সময়ের কাজ সময়ে করি নি। ফেলে রেখেছি। 'সময় গেলে সাধন হবে না।' তাই না পেয়েছি শান্তি, না সার্থকতা। আমাদের জীবন অসমাপ্ত অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। সবকিছু পড়ে আছে অসমাপ্ত অবস্থায়।

একটা মোমবাতির সাফল্য কোথায়? শুধু স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকায়, না জ্বলে জ্বলে আলো দিয়ে নিঃশেষ হওয়ায়? আলো দেওয়াতেই তো

তার সার্থকতা। আমাদের জীবনও তা-ই। নিরন্তর কাজের ভেতর জ্বলে ছাই হয়ে চারপাশটাকে আলোয় ভরিয়ে দিতে পারলেই তার সার্থকতা।

পৃথিবীতে আমরা কত বছর বাঁচি? ৬০, ৭০, ৮০ বড়জোর ৯০ বা হয়ত আরও একটু বেশি। বুদ্ধ, যিশু, রসুলুল্লাহ (স), সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল, নিউটন, আইনস্টাইন–তাঁরা কি এর চেয়ে বেশি বেঁচেছেন? এটুকু জীবনই তো সবাই পায়। তাঁরাও তা-ই পেয়েছেন। অথচ এটুকু জীবনকে কাজে লাগিয়েই তো তাঁরা আজ অনন্য মানুষ। আমরা অনেকেই তো ওই সময়টা পাই। অনেকে তাঁদের চেয়ে বেশিও পাই। কিন্তু অত কাজ রেখে যেতে পারি কি? পার্থক্যটা কোথায়? একটা জায়গাতেই : কাজের পরিমাণে। কাজ যেমন অবিশ্বাস্য অর্জনকে সম্ভব করে তোলে তেমনি সাহায্য করে বিষণ্নতা নিষ্ক্রিয়তা থেকে মুক্তি পেতে।

যাঁদের নাম বললাম, এসব বড় মানুষেরা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজের ভেতর প্রজ্বলিত রেখেছেন। আলেকজান্ডার মারা গিয়েছিলেন মাত্র ৩২ বছর বয়সে। এর মধ্যেই তিনি অর্ধেক পৃথিবীর সম্রাট হয়েছিলেন। অসম্ভব মনে হলেও কথা তো সত্যি। বাস্তব তো তা-ই। আমরাও যদি তাঁদের মতো ওভাবে কাজ করি, আমরা অত বড় না হলেও আমাদের ক্ষমতার সমান তো হতে পারব। অন্তত হতাশা নৈরাশ্য নিষ্ক্রিয়তা কাটিয়ে সুস্থ, সুন্দর আর উৎফুল্ল জীবন তো পাব।

তাই আসুন, জীবনকে আমরা কাজ দিয়ে ভরে দিই। আমরাও এমনি অর্থপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠি। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে নিঃস্বতার হাহাকারে জীবনকে দুর্বিষহ করে লাভ নেই। যদি তা না করি, তবে অবহেলার অপরাধে নিশ্চয়ই আমাদের শাস্তি পাওয়া উচিত। পৃথিবীতে শুধু যে পাপের শাস্তি থাকা উচিত, তা না; গাফিলতির শাস্তিও থাকা উচিত।

একটা কথা আপনারা সবাই জানেন, 'লেখাপড়া করে যেই গাড়িঘোড়া চড়ে সেই।' কথাটা একজন ভালো ছাত্র যেমন জানে একজন খারাপ ছাত্রও তেমনি জানে। কিন্তু ভালো ছাত্রটি জানে কখন? বছরের প্রথম দিনটিতেই। তাই প্রাণপণ শ্রমে চেষ্টায় সারাবছর পড়াশোনা করে তারা পরীক্ষায় ভালো ফল করে। কিন্তু খারাপ ছাত্রেরা কথাটা ঠিকমতো জানে কবে? পরীক্ষাটা যেদিন শেষ হয়, সেদিন। সেদিন তার 'ওহো আহা' আর কোনো কাজে আসে না।

অতএব, আমরা যদি দুঃখ ব্যর্থতা বা যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচতে চাই, তবে আসুন, আজকেই কাজ শুরু করে দিই। নিদ্রাহীন, শ্রান্তিহীন অজস্র আনন্দময় কাজ। আবার বলি—কাজ মানেই সাফল্য, সাফল্য মানেই আনন্দ। তাই কাজের মধ্যে বাঁচা মানেই আনন্দের মধ্যে বাঁচা। আর এই আনন্দের পথ হল, আমাদের প্রত্যেকের বুকের মধ্যে যে ব্যক্তিগত পর্বতচূড়াটি আছে তাকে জয় করতে ঝাঁপিয়ে পড়া।

আর একটা কথা হল : বিশ্বাস। আমি যা করব বলে স্থির করলাম, তাকে আমার পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে হবে। লক্ষ করে দেখুন—আমাদের শরীরের কোনো প্রত্যঙ্গ কি পেছনের দিকে যাওয়ার জন্য তৈরি? তা তো নয়। এদের সবারই গতি সামনের দিকে। আমাদের পায়ের স্বাভাবিক গতি কোন দিকে? সামনের দিকে। হাতের? সামনের দিকে। চোখের দৃষ্টি সামনে। আমাদের নাক কান ঠোঁট কপাল সবকিছু তো সামনের দিকেই উদ্যত। আমাদের গোটা অস্তিত্বই তৈরি হয়েছে সামনে যাওয়ার জন্য। এটা ঠিক যে, প্রয়োজনে আমরা পেছনেও যেতে পারি। দরকারে পেছনে হাঁটতেও পারি। ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাতেও পারি। কিন্তু তা বিশেষ প্রয়োজনে, ব্যতিক্রম হিসেবে, সামনের যাত্রাকেই আরও শক্তিশালী করার জন্য।

মানুষকে যে শুধু সামনের দিকে যেতে হবে তা না, দরকারে পেছন দিকে যাওয়ারও সুযোগ থাকতে হবে। তার প্রয়োজনও আছে। তবে তা আমাদের সম্মুখ যাত্রায় বাড়তি সুবিধা দেওয়ার জন্য। প্রকৃতি তা আমাদের দিয়েও রেখেছে, যাতে বিপদগ্রস্ত হলে কিংবা বৈরী পরিস্থিতিতে আমরা এর ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু আমাদের শরীরের মূল যাত্রা কোন দিকে? নিশ্চয়ই সামনের দিকে। চেষ্টা, কষ্ট, শ্রম, সংগ্রাম সবকিছু দিয়ে আমরা তো সেদিকেই যাই।

শুধু আমরা কেন, প্রাণীজগৎ উদ্ভিদজগৎ আলো বাতাস গ্রহ নক্ষত্র বিশ্ব মহাবিশ্ব সবই কি সেদিকে যাচ্ছে না? যাকে আমরা পশ্চাৎগতি বা নেতি বলি, যেমন : পতন মৃত্যু ক্ষয়—এগুলোর গতিও কি আসলে নিজ নিজ সময়ের অনুকূলে নয়? কেবল আমাদের বিশ্বাস করতে হয় সামনে আমি যাবই। এটাই আমাদের একমাত্র গন্তব্য। তাহলেই আমাদের যাওয়া হয়ে যাবে। কিন্তু পাহাড়ে উঠতে গিয়ে কেউ যদি ওপরের দিকে না তাকিয়ে

নিচের দিকে তাকায়, তার কি এই বিশ্বাস থাকবে? ভয়ই তো তার বিশ্বাসকে ধ্বংস করে দেবে।

সুতরাং নিজেকে বলতে হবে–চল, সামনে চল। একমাত্র সামনে। ভাবতে হবে এটিই একমাত্র পথ। এ ছাড়া কিছু নেই, কিছু চিনি না। যে বিশ্বাস আর অনুশীলনের শক্তি দিয়ে মানুষ হাতের এক আঘাতে পাঁজা করা ইট ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলে, সে একাগ্রতা দিয়ে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। আমাদের সামনের বাধা খান খান হয়ে যাবে।

মানুষ মহাবিশ্বে রকেট পাঠিয়েছে। এ কি বিশ্বাস করার মতো কথা? একটা প্লেন আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, তিনশ টন ওজন–কিংবা তারও বেশি। কী আলতোভাবে সে ভেসে চলেছে আকাশে! অথচ ১০-১৫টা হাতি একসঙ্গে উড়ে যাওয়ার মতো এই ব্যাপার। এই যে আজ আমরা অবিশ্বাস্য এক সভ্যতার নিচে বসে আছি, এর কোনোকিছুই কি বিশ্বাস ছাড়া হয়েছে? তাহলে কেন নেতিবাচকতা? কেন আত্মবিশ্বাসের অভাব? কেন মানুষ পেরেছে ওসব? পেরেছে কারণ মানুষ রক্তের কণায় কণায় ভাবতে পেরেছে, হবেই। শামসুর রাহমান কবিতায় যেমন লিখেছেন, *এই বাংলায়/ তোমাকে আসতেই হবে, হে স্বাধীনতা*–তেমনিভাবে। বিশ্বাস করতে হবে, আমি পারব।

আবার শুধু বিশ্বাস করে কাঁথামুড়ি দিয়ে ঘুম দিলে কিন্তু হবে না। আক্রমণ করতে হবে। কী দিয়ে? ঐ চেষ্টা, ঐ প্রশিক্ষণ, ঐ কৌশল, ঐ সাধনা, ঐ একাগ্রতা, ঐ আত্মবিশ্বাস, ঐ ইতিবাচকতা–সবকিছু দিয়ে। তারপর একসময় দেখবেন ইট টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

জাদুশিল্পী জুয়েল আইচের কাছে আমি একদিন একটা সুন্দর গল্প শুনেছিলাম। গল্পটা একজন হাইজাম্প কোচের। পর পর তিনটা অলিম্পিকে দেখা গেল, হাইজাম্পে গোল্ড মেডেল পেয়েছে তাঁর ছাত্রেরা। সবাই হতবাক। কে এই রহস্যময় মানুষ? কী তাঁর প্রশিক্ষণ-জাদু! কীভাবে কোন কৌশলে ছাত্রদের শেখান তিনি হাইজাম্পের অলীক মন্ত্র, যার ফলে তারা অলিম্পিকে এমন অবিশ্বাস্য সাফল্য অর্জন করে? সবাই একসময় দলবেঁধে গেল সেই কোচের কাছে, তাঁর শিক্ষা কৌশলের গোপন রহস্য শুনতে। গিয়ে জিগ্যেস করল, কী মন্ত্র দেন আপনি ওদের? কী কৌশলে শিক্ষিত করে তোলেন?

তিনি বললেন, আমি ওদের তেমন কিছুই বলি না। আমি প্রথমত একটা কাজ করি। ধরা যাক, ছ-ফুট বা সাত ফুট পরিমাণ উচ্চতা তাদের লাফ দিয়ে পার হতে হবে। আমি তার কয়েক ইঞ্চি ওপরে একটা বার বসিয়ে দিই। দিই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে এসে সেটা পার হতে বলি না। শুধু বলি, ওই ছয় বা সাত ফুট উঁচু বারের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবতে থাক যে, দৌড়ে এসে বারটা তুমি পার হয়ে চলে যাচ্ছ। বার বার কথাটা বলে বলে সেটা নিজেকে বিশ্বাস করাতে থাকো। এভাবে করতে করতে একসময় এমন একটা সময় আসবে যখন দেখবে, তোমাদের মন ও শরীর কথাটাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে ফেলেছে। আর সেই বিশ্বাসের ভেতর তোমাদের শরীর একসময় হয়ে উঠেছে পাখির পালকের মতো হালকা। তখন দেখবে মনে মনে তোমরা বারটা অনায়াসে পার হয়ে চলে যাচ্ছ। এই যখন তাদের বিশ্বাসের অবস্থা হয়, তখন তাদের বলি, এবার দৌড়ে গিয়ে বারটা পার হও দেখি। তখন তারা দৌড়ে গিয়ে যখন লাফ দেয়, দেখা যায় তারা পাতার মতো উড়ে গিয়ে বারটার ওপাশে পড়ছে।

বিশ্বাস এভাবেই মানুষকে দিয়ে অসম্ভব কাজ করায়। এর মতো দুর্লভ সম্পদ মানুষের আর নেই। যত দুঃসাধ্য কাজই আমরা করতে চাই, বিশ্বাস জাগ্রত হলে তা করে ফেলা সম্ভব। কিন্তু সেখানে বিশ্বাসকে হতে হবে নিরঙ্কুশ। তার মধ্যে কোনো খাদ থাকা চলবে না। নিখাদ আর জন্মান্ধ বিশ্বাস দিয়েই আমরা কেবল হয়ে উঠি অজেয় মানুষ।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে ঢোকার মুখে আমি একটা কথা লিখে রেখেছি। কথাটা হল : 'মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড়'। আমি মনে করি, এই স্বপ্ন আর বিশ্বাসের শক্তিই মানুষের মৌলিক শক্তি। মানব অস্তিত্বের দুর্জয়তম সম্পদ। আজ দেশের বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে যদি এই বিশ্বাসের শক্তি জাগানো যায়, তাহলে কী ব্যক্তিগতভাবে কী জাতিগতভাবে আমরা সবার ওপর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব। এই বিশ্বাস দিয়েই তো মানুষ নিজেকে ছাড়িয়ে ওপরে ওঠে। অসম্ভবের নায়ক হয়। তাই চাই বিশ্বাস। উজ্জ্বল অজেয় সর্বজয়ী বিশ্বাস।

বাইবেলে খুব সুন্দর একটি কথা আছে। কথাটা হল : He went to the top of the hill, himself alone. সে পর্বতের চূড়ায় উঠল, নিঃসঙ্গ একা। কাছাকাছি আরেকটা কথা আছে বাইবেলে : He who

liveth, he who believeth, shall never die. যে বাঁচবে, বিশ্বাস নিয়ে বাঁচবে, তার মৃত্যু হবে না। সুতরাং আসুন, একদিকে বিশ্বাস আর একদিকে চেষ্টা ও সংগ্রাম নিয়ে আমরা এগিয়ে চলি। জীবনকে আক্রমণ করি। এর দুর্জয় ঝাণ্ডাকে নিজের রক্তে রাঙিয়ে তুলি।

আমার আজকের শেষ কথাটা এই : নিজেকে আর নিজের জীবনকে যেন আমরা কাজ দিয়ে ভরে রাখি। চৌদ্দ শতকের দুর্ধর্ষ মোঙ্গল সেনাপতি তৈমুর লং-এর কথা আপনারা জানেন। অনেক মজার গল্প প্রচলিত আছে তাঁকে নিয়ে। তার একটা আপনাদের শোনাই। পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করে যে সাম্রাজ্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার রাজধানী ছিল সমরখন্দ। তৈমুর ইরানের সিরাজ শহর আক্রমণ করে অধিকার করে নেন। সিরাজের বহু মানুষ সে আক্রমণে নিহত হয়।

সে-সময় সিরাজ শহরে একজন খুব বিখ্যাত কবি বাস করতেন। তিনি ইরানের কবি হাফিজ। তাঁর সুন্দর একটা কবিতা আছে, আপনারা সবাই জানেন কবিতাটা। কবিতাটার মর্মার্থ এরকম : প্রিয়ার গালের কালো তিলের জন্য আমি সমরখন্দ ও বুখারা বিলিয়ে দিতে পারি।

তৈমুর তখন রীতিমতো দিগ্বিজয়ী বীর। দেশের পর দেশ, সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য–একের পর এক ধ্বংস করছেন তিনি। তাঁর প্রবল প্রতাপের সামনে দাঁড়ানোর সাহস কারো নেই। তৈমুর কবিতা পছন্দ করতেন। স্বাভাবিকভাবে হাফিজের এই কবিতা তৈমুরের কানেও পৌঁছেছে। সিরাজ শহর দখল করে তৈমুর আদেশ দিলেন, হাফিজকে ডাকো। সৈন্যরা হাফিজকে খুঁজে বের করে সম্রাটের দরবারে হাজির করল।

হাফিজ তো কবি মানুষ, আবার সুফিও। তাঁর বেশভূষা সাধারণ। একেবারেই শাদামাটা। (বলতে পারেন প্রায় আমার মতোই। আমি যখন আজ এই পাঞ্জাবিটা পরে এখানে আসছিলাম, আমার গিন্নি তখন বলছিলেন, ওটা পরে যেও না, ওটা তো একেবারে ভর্তা হয়ে গেছে।) তো, কবি হয়ত এর চেয়েও একটা 'ভর্তা' গায়ে দিয়ে তৈমুরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তখনকার দিনে এমন শাদামাটা পোশাকে সম্রাটদের সামনে যাওয়া ছিল প্রায় ঔদ্ধত্যের শামিল। নিয়মই ছিল, সোনাদানা খচিত উৎকৃষ্ট পোশাক পরে কুর্নিশ করতে করতে সম্রাটের

সামনে যেতে হবে। কিন্তু হাফিজ তো সাধারণভাবে গেছেন। ফলে তাঁর বেয়াদবি দেখে তৈমুর ক্ষুব্ধ।

তৈমুর আধা ক্রুদ্ধ স্বরে হাফিজকে জিগ্যেস করলেন, আপনি কি সেই কবি যিনি লিখেছেন–'প্রিয়ার গালের কালো তিলের জন্য সমরখন্দ বুখারা দিয়ে দিতে পারি'। হাফিজ বিনীতভাবে বললেন, জ্বি হুজুর, আমিই তার লেখক। শুনে তৈমুর বললেন, লিখেছেন তো আপনি মনের আনন্দে। কিন্তু জানেন সমরখন্দ বুখারা কার? কে এর মালিক? ওর জন্য কত মৃত্যু, কত আগুন, রক্তের বন্যা? আর আপনি সেগুলো প্রিয়ার গালের কালো তিলের জন্য দিয়ে দিলেন?

এদিকে হাফিজও টের পেয়েছিলেন–তার শাদামাটা পোশাক দেখে সম্রাট রুষ্ট হয়েছেন। তাই রসিকতা করে বললেন, 'সব জানি হুজুর।' তারপর নিজের ছিন্ন পোশাকটা সম্রাটের সামনে মেলে ধরে বললেন–হুজুর, এভাবে বদান্যতা করতে করতেই তো আজ এই অবস্থা। মানে, শুধু প্রিয়ার তিলের জন্যই যদি সমরখন্দ বুখারা দিয়ে দিতে পারি, তবে বাকি সৌন্দর্যের জন্য কত কী দিতে হয়েছে একবার ভেবে দেখুন। সব হারিয়ে আমার এখন আর যে কিছু নেই সম্রাট। হাফিজের এই প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে তৈমুর নাকি খুশি হয়ে তাঁকে পুরস্কৃত করেছিলেন।

এই তৈমুরকে একবার জিগ্যেস করা হয়েছিল : আপনি সারাজীবন গোটা পৃথিবীকে এভাবে আক্রমণ করে বেড়ালেন কেন? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'সমরখন্দকে নিরাপদ রাখার জন্য।' ধ্বংস আর আক্রমণে চারপাশকে তিনি এমনই দিশেহারা করে রেখেছিলেন যেন সমরখন্দ আক্রমণের চিন্তা কারো মাথাতেই আর আসতে না পারে।

কথাটা এজন্য বললাম যে, তৈমুরের মতো আমাদেরও এই জীবনকে আক্রমণ করে ফিরতে হবে। কাজে, সংগ্রামে জীবনকে এমনভাবে ভরিয়ে রাখতে হবে, যাতে জীবন নিজেকে অপচয়ের সুযোগ না পায়। এর প্রতিটি মুহূর্তকে ক্ষান্তিহীন কর্মোদ্যমে প্রজ্বলিত আর অনুপম করতে হবে। এ করতে হবে জীবনকে সুখী করার স্বার্থেই। কোনোভাবেই পিছু হটা যাবে না। এমনকি ভাবনাতেও না। যত বেশি কর্মমুখর ইতিবাচকতা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া যাবে, জীবন তত হবে ইতিবাচক। তাহলে নেতিবাচকতা, হতাশা, বিষণ্নতা আমাদের ধরতে পারবে না।

আলোকিত জীবন

একটি যুগের ভেতর যে দুঃখ আর বেদনাগুলো থাকে, সে যুগের প্রতিটি সচেতন ও বেদনাবান মানুষকে সেসব দুঃখের সাধ্যমতো জবাব দিতে হয়। এই সংগ্রাম আর আত্মোৎসর্গের পথ ধরেই মানুষ তার নিজের অসহায়তাগুলোকে ধীরে ধীরে অতিক্রম করে। রচিত হয় মানবসভ্যতার উচ্চতর সোপান।

মহাজাতক শহীদ আল বোখারী একসময় তাঁর চারপাশের মানুষের ভেতর আধ্যাত্মিক নিঃস্বতার এই অন্ধকার লক্ষ করেছিলেন। দেখেছিলেন আত্মশক্তি বা আত্মোৎবোধনের অভাবে, মনের একাগ্রতা ও শৃঙ্খলার অনটনে বহু মানুষ কী করে শারীরিক-মানসিক নৈরাজ্য ও নিষ্ক্রিয়তায় ভুগে মানবজন্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলছে। সেইসঙ্গে হারাচ্ছে নিজেদের ন্যূনতম সুস্থতা ও শান্তি। কোয়ান্টাম মেথড মেডিটেশনের মাধ্যমে তিনি তাদের দিকে শুশ্রূষার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর চেষ্টার ফলশ্রুতিতে বহু মানুষ নানা মানসিক নিষ্ক্রিয়তা থেকে সেরে উঠে আলোকিত জীবনের পথ খুঁজে পেয়েছে। যে আত্মাহীন নৈরাজ্যপূর্ণ যুগের আক্রমণে আজ আমাদের প্রতিটি মানুষের স্নায়ু গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, মানুষ প্রতিমুহূর্তে সুস্থতা হারাচ্ছে, সে মুহূর্তে মহাজাতকের এই সেবার উদ্যোগ সেই মানবিক ধসের বিরুদ্ধে একটি সুস্পষ্ট প্রতিরোধ।

আজ তিনি কোয়ান্টামকে এক বৃহৎ পারিবারিক রূপ দিয়েছেন। তাঁর

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩০০ তম ব্যাচপূর্তি উপলক্ষে দেওয়া শুভেচ্ছাবাণী, জুলাই ২০০৯

পরিবারের সভ্যেরা সবাই দোসর হিসেবে বন্ধু হিসেবে যে অভিন্ন একাত্মতায় জ্বলে উঠেছেন, তা-ও মনকে মুগ্ধ করে। তাঁদের মাধ্যমে তিনি যেসব সামাজিক কার্যক্রম সফল করে চলেছেন–লামার অবিশ্বাস্য কার্যক্রম, রক্তদান কর্মসূচি, দাফন কার্যক্রম, মাতৃমঙ্গল, যাকাত ফান্ড, মেডিকেল ক্যাম্প থেকে শুরু করে অন্যান্য বহু কার্যক্রম–সেসবের সাফল্যও অনন্য।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩০০ তম পর্বের পূর্তি উপলক্ষে এই প্রতিষ্ঠানের বিরল সাফল্যকে আমি অভিনন্দন জানাই। আজকের বাংলাদেশে আত্মস্বার্থসর্বস্ব পরিবেশে এমন সাফল্য বিরল।

ইতিবাচকতার সপক্ষে

এই মুহূর্তে আমি কী নিয়ে বলব, তা এখনও আমার কাছে স্পষ্ট নয়। হঠাৎ টেনেহিঁচড়ে মঞ্চে তুলে দিলে সবার এই অবস্থাই হয়। হয়ত আমার কথা কিছুটা এলোমেলো হবে। হয়ত সেই বিশৃঙ্খল কথাবার্তা কিছুক্ষণ আপনাদের সহ্য করতে হবে। তাই সতর্ক সংকেত দিয়ে রাখলাম। ঠিক ১০ নম্বর সংকেত নয়, দুই বা তিন নম্বর বা এমনি কিছু।

আজ যা নিয়ে আমাকে বলতে বলা হয়েছে, তা হল, ইতিবাচক চিন্তার গুরুত্ব। আমার বক্তব্য, চিন্তা যদি করতেই হয় তবে তা তো ইতিবাচকই হওয়া উচিত। নেতিবাচক চিন্তায় লাভটা কী? আমরা এই যে আজ সুসজ্জিত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে কথাবার্তা বলছি, অবিশ্বাস্য সব বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন ব্যবহার করে অনুষ্ঠান করছি, এই যে বিস্ময়কর মানবসভ্যতার শীর্ষে দাঁড়িয়ে আছি, এর একটি ফোঁটাও কি নেতিবাচকতার ফসল? তাহলে কেন নেতিবাচকতা? কোন লাভের আশায়? কী দেয় এ আমাদের? যা-কিছু মানুষ এ-যাবৎ অর্জন করেছে তা আশা আর ইতিবাচকতা দিয়েই তো করেছে।

রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতায় ইতিবাচকতার এই শক্তিকে খুব অনবদ্যভাবে তুলে ধরেছেন। বলেছেন,

আমার মতে জগৎটাতে ভালোটারই প্রাধান্য–
মন্দ যদি তিন-চল্লিশ, ভালোর সংখ্যা সাতান্ন।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত মুক্ত আলোচনায় প্রদত্ত বক্তব্য, ১৯ জুলাই ২০০৫

আমি অক্ষরে অক্ষরে কথাটা বিশ্বাস করি। তিন-চল্লিশ মানে ৪৩। ৪৩ খারাপ থাকবেই। কেননা শয়তান কেবল আল্লাহ অনুমোদিত নয়, আল্লাহ সৃষ্টও। সে হচ্ছে আল্লাহর সামনে মানবজাতির পরীক্ষাবিশেষ। অনুমোদিত এজন্য যে, ওই ৪৩-এরও দরকার আছে। শয়তান যদি না থাকত তবে আমাদের সংগ্রাম শেষ হয়ে যেত। 'সব পেয়েছি'-র আরাম কেদারায় আমরা জবুথবু হয়ে শুয়ে থাকতাম। শয়তান আছে বলেই আমি নিদ্রাহীন হয়ে আছি। চতুর এই শত্রুটাকে পরাজিত করার জন্য অহোরাত্র সক্রিয় রয়েছি। উঠে দাঁড়াচ্ছি, যুদ্ধ করছি।

শয়তান না থাকলে আমরা থেমে যেতাম। আমাদের বিপদ-বিপর্যয় শত্রু-প্রতিদ্বন্দ্বী থাকত না। শয়তান আছে বলেই জাহাজ ডোবে। প্লেন অ্যাকসিডেন্ট হয়। সভ্যতা ধ্বংস হয়। তাই উচ্চপ্রযুক্তিসম্পন্ন জাহাজ, প্লেন আর সভ্যতার উত্থান ঘটে। শক্তিমান শত্রু পাওয়ায় আমাদের শক্তি বেড়ে যায়। কাজেই এই শয়তানকে আপাতভাবে নেতিবাচক মনে হলেও এ আসলে একটা ইতিবাচক জিনিশ। মানব-সমৃদ্ধির জন্য তাই এ অনুমোদিত। মানবজাতির সে-ও তো এক ধরনের ভবিষ্যৎ।

এই অর্থে পৃথিবীর যা-কিছুকে আমরা নেতিবাচক মনে করি, শেষ বিচারে তা সবই ইতিবাচক। প্রমাণ, এদের নিয়েও পৃথিবী সামনের দিকে এগোচ্ছে। শয়তান অর্থাৎ ওই ৪৩ ভাগ মন্দ বলেই বাকি ৫৭ ভাগ ওকে হটিয়ে একশ হতে চায়। ৪৩-কে ছুঁড়ে ফেলে ডাস্টবিনে। না হলে আমরা হয়ে যেতাম নিখাদ ৫৭। হয়ত শয়তানের ধাক্কায় আরও নিচে নেমে যেতাম। মানবজাতি ৫৭ দিয়ে বাঁচে না। তার টিকে থাকতে ও সম্পূর্ণ হতে একশ লাগে। শয়তান আমাদের ওই একশ হতে প্ররোচিত করে। তাই সুখের পাশাপাশি আমাদের দুঃখ লাগে। আলোর পাশাপাশি অন্ধকার। দুইয়ে মিলেই আমরা একশ হই। সম্পূর্ণ হই। যেমন সংসদে যে প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়, ধরা হয় তা সর্বজনীনভাবে ভোট পেয়েছে। জীবনে সবই তাই শেষপর্যন্ত ইতিবাচক। পৃথিবীতে ৫৭ বা ৪৩ নেই। এখানে সবই একশ। নেতিবাচকতা একটা ভ্রান্তি। ও ডিকশনারিতে আছে, বাস্তবে নেই।

এখন প্রশ্ন, কী করে এ ৫৭-কে আমরা একশ করব। আমার উত্তর এ-ও সম্ভব ওই ইতিবাচকতার মাধ্যমেই। একটা উদাহরণ দিই।

ধরা যাক, কোনো বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যে-কোনো সিদ্ধান্তের মধ্যেই ভালো এবং মন্দ দুটো দিকই থাকে। ধরা যাক, একটি সিদ্ধান্ত নিলে খারাপ হবে ৪৯, ভালো হবে ৫১। তখন আমরা কীভাবে সিদ্ধান্ত নিই? আমরা পুরোপুরি ৫১-র পক্ষে গিয়ে ৫১-কে একশ বানিয়ে ফেলি। বানিয়ে ৪৯-এর জন্য কি কাঁদতে বসি? না, কাঁদি না। বরং বাকি ৪৯-কে বানিয়ে ফেলি শূন্য। না হলে সিদ্ধান্তটা নিখাদ হয় না। যারা সাহসের সাথে সিদ্ধান্ত নেয় তারা এটাই করে। এটা পারে বলেই তারা দ্বিধাদ্বন্দ্বহীনভাবে এগিয়ে যায়; জয়ী হয়। যা আছে তা দিয়েই একশভাগ শক্তিতে কাজ করতে পারে। যারা এটা না পেরে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে, তারা হেরে যায়। এভাবে বেশির পক্ষে চলে যেতে পারাই হল ইতিবাচকতা। এটা না পারলে আমাদের অবস্থা হত হ্যামলেটের মতো–*টু বি, অর নট টু বি* ধাঁচের। একবার এদিক টানত তো একবার ওদিক। এই টানাহ্যাঁচড়ার মাঝখানে পড়ে আমরা হয়ে পড়তাম বেসামাল।

ইতিবাচকতা মানে কী? ইতিবাচকতা মানে বিশ্বাস করা যে, পৃথিবীতে 'ভালো' বলে একটা ব্যাপার রয়েছে, যা জীবনের পুরোপুরি অনুকূল। আমাদের বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের পুরনো ভবনের সামনে একসময় একটা আমগাছ ছিল। একদিন দেখলাম তার নিচে বসে চার-পাঁচটা ছেলে একটানা সারা পৃথিবীর নিন্দা করে চলেছে। তাদের মতে, এদেশে ভালো বলে কিছু নেই, কেউ ভালো নেই, সবাই খারাপ।

আমি তাদের বললাম, তোমাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে সারা পৃথিবীর সবাই খারাপ। সবকিছু খারাপ। কিছু আর বাকি নেই। সব শেষ। সব নষ্ট। তাহলে ভালো হওয়ার দায়িত্ব এখন কার? তোমাদেরই তো। একমাত্র তোমরাই তো এখনও বিশুদ্ধ। নূহ নবীর নৌকার সেই জীবকূলের মতো মহাপ্লাবনের ঝড়-ঝঞ্ঝা আর তাণ্ডব এড়িয়ে তোমরাই তো শুধু বেঁচে আছ এখনও। কাজেই ভালো তো এখন তোমাদের দিয়েই শুরু হতে হবে। কিন্তু তোমরা তা তো হচ্ছ না। বরং দেখছি তোমরাও নিন্দা করে করে তাদের মতোই খারাপ হয়ে যাচ্ছ। এতে কার লাভ হচ্ছে? যাদের গালাগাল দেওয়া হয়, তারাই কি শুধু খারাপ? যারা নিন্দা করে তারা খারাপ নয়? নিন্দা কে করে? অক্ষম অযোগ্য নিষ্কর্মা মানুষই তো নিন্দা করে–যে কিছুই করে না, কিছুই পারে না, সবকিছুতেই ব্যর্থ,

যার আত্মবিশ্বাসের অভাব আছে—সে-ই তো। তারা অন্যের কাজের সমালোচনার মধ্যে নিজের ব্যর্থতার সান্ত্বনা খোঁজে।

তাই নিন্দুকই পৃথিবীর সবচেয়ে নেতিবাচক মানুষ। তার প্রতিটি নিন্দা আসলে তার ব্যক্তিগত অক্ষমতারই আর্তস্বর। সে নিজে কিছু করতে পারছে না বলে অন্যের সাফল্য তার কাছে অসহ্য। অন্যকে ধ্বংসের জন্য তাই সে মরিয়া। এটাই নেতিবাচক মানসিকতা।

অন্যকে নিন্দার ছদ্মনামে মানুষ কিন্তু আসলে নিজেকেই তিলে তিলে খুন করে। নিজের ভেতরের শক্তিকেই শেষ করে। সেজন্য যে মানুষ খারাপ কাজ করে সে যেমন নিন্দনীয়; যে মানুষ খারাপ কথা বলে, আঘাত দিয়ে অন্যের হৃদয় ভেঙে দেয় বা তাদের আশাবাদকে নষ্ট করে, সে-ও একই রকম নিন্দনীয়। এরা ক্ষতিকর, এরা মানব বিকাশের শত্রু।

আবার এটাও ঠিক, সমালোচনা আমাদের দরকার। না হলে নিজেদের ভালোমতো জানব কেমন করে? নিজেরা কী করছি, সেটা কতটা ভালো বা মন্দ তা সবসময় বুঝে ওঠা যায় না। তাই সমালোচনা দরকার। কিন্তু সমস্যা হল, বাংলাদেশে সমালোচকের সংখ্যা এতই বেশি যে, মনে হয়, আমাদের দেশে সমালোচকই আছে, মানুষ নেই। কথায় কথায় বিদ্রূপ, কারণে-অকারণে আক্রমণ, সামান্য ত্রুটিতেও নিন্দা-গিবত। যেমন : কিছু লিখলে বলবে—'বলুন, এ কি কোনো লেখা হল? ভালো কি হত না আরও ভালো হলে?' যেন কথাটা কেউ জানে না। আবার না লিখলে বলবে—'উনি যে লিখছেন না, এ কি ঠিক হচ্ছে? ভেতরে এত কথা নিয়ে এমন চুপ করে থাকা! এ তো বিবেকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। বলুন, এসব খারাপ কিনা? কাজেই বন্ধুগণ, আমরা একবাক্যে বলতে পারি : উনি খারাপ।'

অর্থাৎ কাজ করলে তো সমালোচনা করবেই, না করলেও করবে। কিছুতেই মুক্তি নেই। আমাদের দেশে মানুষকে ভালোর জন্য প্রশংসা করতে, উৎসাহ দিতে প্রায় দেখাই যায় না। প্রশংসা এখানে ভারি দুর্লভ জিনিশ। এভাবে ক্রমাগত আক্রমণে মানুষ একসময় ভেঙে পড়ে, জাতি মরে যায়। অথচ প্রশংসা করতে টাকা লাগে না। কিছু দিতে হয় না। শুধু একটু ভালোবাসা আর মমতা আদর—এই যা। দরকার একটু উৎসাহ আর আদর। শুধু বললেই হয় কারো—'এগিয়ে যাও! কাজ কর। তুমি

পারবেই।' এতটুকু কথার জন্য মানুষ সাত সমুদ্র পেরোতে পারে। নিজের জীবনের কথাই বলি।

ছাত্রবয়সে আমার ওপর পরিবারের আশা ছিল বড় রকমের। এটা হব, সেটা হব, এইসব। কিন্তু ততদিনে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন হয়ে গেছে। আমার মধ্যে তখন বাংলা ভাষা নিয়ে একটা বড় ধরনের স্বপ্ন : এই ভাষার সমৃদ্ধির জন্য কাজ করব, একে বড় করে তুলব। ঠিক করলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় অনার্স নিয়ে পড়ব। কিন্তু আমার এই ভাবনা পুরো পরিবারের মধ্যে একটা বিরাট ক্ষোভ আর হতাশা জাগিয়ে তুলল। সবার ধারণা হল, আমাকে দিয়ে ভালো কিছু হওয়া হয়ত সম্ভব ছিল, কিন্তু আমার বোকামির জন্য তা আর হবে না। তখনকার দিনে ভালো কিছু মানে ছিল মোটামুটিভাবে সিএসপি অফিসার হওয়া। না হলে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা অর্থনীতিবিদ, নিদেনপক্ষে ইংরেজির ছাত্র। সে-কালে এদেশে সিএসপি-রা ছিল পুরোদস্তুর রাজপুত্র। অর্ধেক রাজ্যসহ রাজকন্যা তাদের জন্য অপেক্ষমাণ। কিন্তু সেসব বিবেচনায় না নিয়ে আমি বাংলায় পড়তে চাই–এ কেমন কথা! সবাই নিদারুণভাবে মর্মাহত।

সেই দুর্দিনে উদ্ধার হয়ে দেখা দিলেন আব্বা। আমাকে একটা ঢাকাগামী বাসে তুলে দেওয়ার জন্য আমাদের মফস্বল শহরটির বাসস্ট্যান্ডে এসেছিলেন তিনি। বাস ছাড়তে তখনও কিছুটা দেরি। আমরা পাশাপাশি হাঁটছি। হঠাৎ আব্বা আমাকে কিছু কথা বলতে শুরু করলেন। না, পিতা হিসেবে নয়, আমার আজীবনের শিক্ষক আর পথপ্রদর্শক হিসেবে। নিজের বুকের বাঁ দিকের ওপর হাত রেখে আমাকে বলতে লাগলেন, 'দেখ্, আমাদের বুকের এখানটায় একজন মানুষ বাস করে। সে কথা বলে। নিমগ্ন হয়ে কান পাতলে তার গলার স্বর শোনা যায়। কখনো বিপদে-সংকটে পড়লে কী করণীয় তা জানতে সবসময় তার কাছে জিগ্যেস করবি। সে যেদিকে যেতে বলবে জন্মান্ধের মতো সেদিকে চলে যাবি। সেখানে তোর বাবা নেই, মা নেই, আত্মীয় নেই, বন্ধু নেই, কেউ নেই। সেখানে তুই একা। রাজার মতো একা।'

পৃথিবীতে রাজার কোনো বন্ধু থাকে না। তাঁর থাকে সৈন্যবাহিনী, সহকর্মী, অনুসারী আর জিন্দাবাদের লোকজন। এদের দরকারে কাছে টানতে হয়, দরকারে বিদায় দিতে হয়। এরা কেউই আপন নয়।

হাতিয়ার মাত্র। তাঁর বন্ধু কেবল একজন–তাঁর মুকুট। ইংল্যান্ডের রানি প্রথম এলিজাবেথের তো প্রেমিকের শেষ ছিল না। তাঁর সম্বন্ধে কেউ একজন লিখেছিলেন, তিনি যখন কারো সাথে করমর্দন করেন তখন তাঁর হাত করমর্দন করে একজনের সঙ্গে, চোখ তাকায় আরেকজনের দিকে। কান শোনে আরেকজনের কথা, বুদ্ধি কথা বলে আরেকজনের সঙ্গে। তাঁর অনেক প্রেমিকের উল্লেখ করে একবার তাঁকে জিগ্যেস করা হয়েছিল, সত্যি করে বলুন তো আপনার আসল প্রেম কার সঙ্গে? রানি এলিজাবেথ তাঁর মুকুটটা দেখিয়ে উত্তর দিয়েছিলেন–'এর সঙ্গে'।

রাজার প্রেম ওই একটাই। তাঁর মুকুট। তাই রাজা একা, নিঃসঙ্গ। কারণ রাজা সবার ওপরে। দুহাজার মাইলের হিমালয় পর্বতমালায় হয়ত কোটি কোটি লোকের জায়গা হবে, কিন্তু এভারেস্ট-শৃঙ্গের শীর্ষবিন্দুটিতে কজন লোকের জায়গা হবে? শীর্ষ চিরদিন নিঃসঙ্গ। সেখানে বেশি লোকের জায়গা নেই। তাই বাইবেলে বলা হয়েছে : He went to the top of the hill, himself alone. হ্যাঁ, একা। শীর্ষে মানুষ সবসময়ই একা। ওখানে যেতেও হয় একা, বাঁচতেও হয় একা।

আলোচনার মূল বিষয় থেকে কিছুটা হয়ত সরে গেছি। সারাদিন ছাত্রদের সঙ্গে নানা ব্যাপার নিয়ে গল্প করি, তাই এক কথা থেকে অন্য কথায় ছোটাছুটি করা প্রায় বদভ্যাস হয়ে গেছে।

আরেকটা কথা এখানে বলি। সেটা আমাদের মানবজন্ম নিয়ে। এই জন্মকে আমি খুব একটা দুর্লভ ব্যাপার মনে করি। হয়ত সকলেই মনে করেন। মৃত্যু নিয়ে আজকাল আর আমি তেমন একটা ভাবি না। ও তো এখন আমাদের প্রতিদিনের বন্ধু। আমি ভাবি মানুষের জন্ম নিয়ে। কী করে পেলাম এই জীবন আমরা? এমন অসম্ভব একটা জীবন! সামান্য একটা চাকরি পেতেও তো একজন মানুষকে কমপক্ষে ১৬/১৭ বছর পড়াশোনা করতে হয়। কখনও আরও বেশি। তারপর শুরু হয় অ্যাপ্লিকেশন-ইন্টারভিউর পর্ব। কত জুতা-স্যান্ডেল ক্ষয়ে শেষ হয়ে যায়, তা-ও চাকরি হয় না। তারপর শুরু হয় খালু-মামা, মিনিস্টার-ব্যারিস্টার এসব নিয়ে উথালপাতাল। কত কিছুর পরে তুচ্ছ একটা চাকরি জোটায় মানুষ! কী না করতে হয় এর জন্য! আর সেখানে আমরা এরকম একটা অবিশ্বাস্য জীবন পেয়ে গেলাম পৃথিবীতে, একেবারে কিচ্ছু না করে।

কোনো যোগ্যতা লাগল না, পরীক্ষা লাগল না, ইন্টারভিউ দিতে হল না, স্যান্ডেল খোয়ানো নেই, মামা-চাচা, মিনিস্টার-ব্যারিস্টার কিছুই নেই। অথচ পেয়ে গেলাম একটা দুর্লভ সুন্দর, বিস্ময়ে ভরা, আলোয় ভরা একটা জীবন! সত্যি কী করে পেলাম, এমন সুন্দর একটা জীবন আমরা? কী করে সম্ভব হল?

আমি কথাটা লিখেছি আমার একটা বইয়ে। বলেছি : আমরা যে রসগোল্লা খাই তার একটা মিঞা ভাই আছে। রসগোল্লার চাইতে অনেক বড়, রসে-মাধুর্যে একদম ভরা। নাম রাজভোগ। এখন ধরা যাক, গারো পাহাড়ের মতো–এমনি একটা লোভনীয় আর বিশাল রাজভোগ আছে পৃথিবীতে। এখন আপনি যদি ওর মধ্যে একটা পিঁপড়াকে ছেড়ে দিয়ে বলেন, খা, যত রস আর মাধুর্য আছে সব সাধ মিটিয়ে ইচ্ছামতো চেটেপুটে খেয়ে নে। তখন ঐ রাজভোগ পিঁপড়েটার কাছে যেমন অন্তহীন আর অফুরন্ত লাগবে, আমাদের কাছে এই জীবনটাও তো তা-ই। রসে মধুতে ভোগে-উপভোগে পুরোপুরি ভরা।

এরকম দুর্লভ একটা জীবন পেয়েও আমাদের কত জনের কত দুঃখ, কত দীর্ঘশ্বাস! এটা হল না, ওটা পেলাম না। হল যদি, আরও কেন হল না? কিছুতেই সাধ মেটে না। আর না চাইতেই এমন সুন্দর আলোময় একটা জীবন পেয়েও আমাদের একে কী তাচ্ছিল্য আর অবহেলা! সহজে পেয়ে গিয়েছি বলে বুঝতেও পারি না, কী এর মূল্য!

হিন্দু ধর্মে জীবনকে 'মায়া' বলা হয়েছে। বলা হয়েছে 'ছায়া'ও। তাদের ধারণা ছিল, আমাদের আসল জীবন মৃত্যুর ওপারে। সে এক চির সুখের চির পূর্ণতার দেশ। এজন্য হিন্দুরা ইতিহাস লিখত না। তারা ভাবত, কী হবে এই অনিত্য জীবনের কাহিনী লিখে। ফলে হিন্দুদের কাছ থেকে কিন্তু ভারতের ইতিহাস পাওয়া যায় নি। বহু শ্রমে সাধনায় এ উদ্ধার করেছে ইউরোপীয়ানরা। এসব ধ্যানধারণার কারণে ভারতের মানুষ জীবন থেকে মোটামুটি মুখ ফিরিয়েই থেকেছে। ভারত তাই কখনো দারিদ্র্যকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে নি। বরং একে গৌরবান্বিত করেছে। দারিদ্র্যের মধ্যে তারা এক ধরনের গৌরব অনুভব করেছে। পরকালে পুরস্কারের আশ্বাস পেয়েছে। এই সেদিনও তো কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর *দারিদ্র্য* কবিতায় লিখেছেন :

হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান্।
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান
কন্টক-মুকুট শোভা–।

এটাও হয়ত যুগ যুগের ভারতীয় মনোভঙ্গিরই ফল। কিন্তু এ-ও তো ভাবতে হবে, আমার নিজের না থাকলে অন্যকে দেব কী করে? সবকিছুকে সমৃদ্ধ আর সুন্দর করে তুলব কী করে? একজন দুঃখী কী করে আরেকজন দুঃখীর দুঃখ ঘোচাবে? আরেকজন ভিখিরিকে কী করে ভিক্ষা দেবে? দেওয়া তো তার পক্ষেই সম্ভব, যার আছে।

আমাদের দেশে একজন বড় নেতা ছিলেন। তিনি ছিলেন নিঃস্ব রিক্ত মানুষদের নেতা। নির্বাচনের সময় তিনি প্রতীক নিতেন কুঁড়েঘর। নিজে তিনি সরল সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন, দুঃখী-দরিদ্র মানুষের জন্য রাজনীতি করতেন। কিন্তু তিনি বা তার দল কখনও নির্বাচনে জিতেছেন বলে শুনি নি। লোকে তাঁকে ভোট দিত না। আমার কেন যেন মনে হত, ওই কুঁড়েঘর প্রতীকটির জন্যই হয়ত তিনি শেষপর্যন্ত ভোট পেতেন না। হয়ত লোকেরা তাঁর প্রতীক দেখেই ভয় পেয়ে যেত। ভাবত, তাঁকে ভোট দিলে তাদেরও অমনি এক বিমর্ষ কুঁড়েঘরে গিয়েই ঢুকতে হবে।

কিন্তু রাশিয়ার বিপ্লবের আগে লেনিন কী বলতেন? বলতেন, ক্ষমতায় গেলে আপনাদের প্রত্যেককে আমরা মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিংয়ের ফ্ল্যাট দেব। আপনারা সবাই মিলে সেখানে থাকবেন। প্রত্যেকটা বাড়ির দেড় মাইলের মধ্যে লাইব্রেরি তৈরি করা হবে। উন্নত জীবনযাপনের ব্যবস্থা করা হবে সবার জন্য। রাশিয়ার মতো দেশে এটা করা সোজা ছিল না। রাশিয়া কত বিশাল একটা দেশ! সেখানে প্রতিটা বাড়ির নাগালের মধ্যে একটা করে লাইব্রেরি। এ কী কথার কথা? তিনি চেয়েছিলেন বলে পেরেছিলেনও।

আমরা কি এভাবে ভাবি? আমাদের চিরকালীন শিক্ষাই হল প্রত্যাখ্যান। প্রত্যাখ্যান দরকার আছে, কিন্তু বেশি কোনোকিছুই ভালো না। তাই উপনিষদে বার বার সতর্ক করা হয়েছে, শুধু প্রত্যাখ্যান করে হবে না। বলা হয়েছে, *তেন ত্যাক্তেন ভূঞ্জীথা*। অর্থাৎ দেওয়ার মধ্য দিয়ে পেতে হবে। কিন্তু দিতে হলে তো আগে পেতে হবে। এ দুটোর সমন্বয় না ঘটলে জীবন ফলবান হবে কী করে?

যা বলছিলাম মনে পড়েছে। কী সুন্দর একটা জীবনই না আমরা পেয়েছি পৃথিবীতে! আগে আমার ভেবে দুঃখ হত, আহা! এত সুন্দর পৃথিবী থেকে একদিন চলে যেতে হবে? অল্পবয়সে এসব চিন্তা আরও বেশি হত। ওই বয়সে আমাদের মন থাকে স্পর্শকাতর, কচি, অনুভূতিতে ভরা। এ পর্বে জীবন অনেক সুন্দর হয়ে আমাদের কাছে ধরা দেয়। তাই তখন মৃত্যুর কথা মনে হলে আমরা ভেঙে পড়ি।

কিন্তু যে জীবনকে এত অলীক বা সুন্দর মনে হত, সে জীবনটাকে আমরা তো এর মধ্যে অনেকটা দেখে ফেলেছি। এর আনন্দকেও অনেকটা আহরণ করে ফেলেছি। এর দুঃখকেও। তাই মৃত্যুকে এখন আর অত বিষাদাচ্ছন্ন মনে হয় না। তাছাড়া জীবনও তো হাজার হাজার মুহূর্তের ভেতর দিয়ে এরই মধ্যে আমাদের একটু একটু করে মৃত্যুর জন্য তৈরি করে তুলেছে। এখন মৃত্যু আমাদের কাছে মূলত একটি ঘটনা, অনুভূতি নয়। একেকসময় মনে হয় বলি—এসো, মৃত্যু। অনেক তো হল। এখন আমাকে এই দুঃখ-যন্ত্রণার ভার থেকে রেহাই দাও। আমার ধারণা আসলেই হয়ত এ কিছুটা সত্য : মৃত্যুর বেদনাটা ততটা বৃদ্ধ বয়সের নয়, যতটা যৌবনের।

টেলিভিশনের এক অনুষ্ঠানে একদিন এক উপস্থাপিকা আমাকে বলল, স্যার, আপনারা তো বুড়ো হয়ে ছোবড়া হয়ে গেছেন। আমি বললাম, দেখ, আমরা বুড়ো হতে পারি আর তোমরা তরুণ হতে পার; কিন্তু মনে রেখো, তুমি তোমার যৌবনের সমান, আমি সারা জীবনের সমান। তুমি প্রতি মুহূর্তে যা হওয়ার স্বপ্ন দেখছ আমি তো তা-ই। দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। আমার এই জীবনের পরে তো আর কিছু নেই। এখন আমরা ডুবে যাব, ঝরে যাব। তবু ডুবে যাওয়ার মুহূর্তেই তো সবকিছু সুন্দর আর পরিপূর্ণ হতে পারে, তাই না? অস্তগামী সূর্যের রক্তিম ছটায় ভরা পৃথিবী কি দিনের সবচেয়ে রঙিন সময় নয়? শীতপ্রধান দেশে হেমন্ত ঋতুর পাতা ঝরার সময় অরণ্য কি সবচেয়ে অনিন্দ্য হয়ে ওঠে না?

সুতরাং এই জীবন যে এত সুন্দর, এত অপার্থিব—একে তো দুর্লভ সৌভাগ্যেই আমরা পেয়েছি। এমন জীবনকে কোনোভাবে নষ্ট করা হয়ত সত্যিই অপরাধ। এখানে এক মুহূর্তের জন্য বিষণ্ন থেকে জীবনকে অপচয় করার মতো নির্বুদ্ধিতা অপরাধ বা নিজেকে দুঃখী মনে করে

আত্মধ্বংস করার মতো অন্যায় আর হয় না। পিঁপড়ের মতো এ জীবনের প্রতিটা মুহূর্তকে কাজ আর আনন্দ দিয়ে আমাদের ভরে দিতে হবে। কারণ একবার চলে গেলে এ আর কোনোদিন ফিরে আসবে না। জগতে দ্বিতীয়বার কিছু ঘটে না।

ধরা যাক, মৃত্যুর পর দোজখে না গিয়ে না হয় বেহেশতেই গেলাম। নিশ্চয়ই বেহেশত খুব সুন্দর—নিশ্চয়ই এই জীবনের চেয়ে হাজার কোটিগুণ সুখের। কিন্তু *কান্না হাসির দোল দোলানো* এই অনবদ্য জীবনটাকে সেখানে কোথায় পাব? কোথায় পাব ভুলে ব্যর্থতায় অশ্রুতে আনন্দে অপরূপ এই জীবনটাকে? পৃথিবীর সবচেয়ে ঐশ্বর্যময় দেশের চেয়েও যেমন জন্মভূমি সুন্দর, মানুষের কাছে সবকিছুর চেয়ে জীবনটা তেমনি সুন্দর।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা জীবনের গানে ভরা। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন :

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি—
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি
এই মহামন্ত্রখানি,
চরিতার্থ জীবনের বাণী।

জীবন কখন চরিতার্থ হয়? যখন মানুষ অনুভব করে যে, এ জীবন মধুতে ভরা—আনন্দধারা বহিছে ভুবনে। এই মধুময় সুন্দর পৃথিবীতে জন্মেও আমরা যদি বলতে থাকি—কিছুই পেলাম না, কিছুই হল না, কিছুই নেই, তাহলে কী করে হবে?

কিছুদিন আগে হঠাৎ করেই আমি একটা ভালো পুরস্কার পেলাম। বন্ধুবান্ধবদের অনেকে বলল, আপনি এখন রিকগনাইজড। আমি বলেছি, যেভাবে স্বীকৃতির কথাটা বলছেন তাতে তো মনে হচ্ছে এ স্বীকৃতি না, চারপাশে সবার জন্য এ একটা ধমক বিশেষ। যেন এখন থেকে কেউ কিছু উল্টাপাল্টা বললে তাকে ধমক দিয়ে বলা যাবে : এত বড় আস্পর্ধা তোমার! আমার সঙ্গে তর্ক? জানো, আমি কী পুরস্কার পেয়েছি! আপনাদের মুখে রিকগনিশন কথাটা শুনে মনে হচ্ছে শব্দটা যেন অন্যদের ওপর নিগ্রহ চালানোর একটা হাতিয়ার। পুরস্কারটা ওরা আমাকে দিল ভালোবেসে। আর আমি সবাইকে তা দিয়ে দাবড়ে বেড়াব। বাঃ!

আমি যে কারণে পুরস্কারটা পেয়েছি, সেটা পেয়েছি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের জন্য। মাত্র ৩৫ টাকা দিয়ে আমরা এই কেন্দ্র শুরু করেছিলাম। কী চপল আনন্দে-ভরা উজ্জ্বল অনাবিল দিন তখন আমাদের! এসব কি শুরু করেছিলাম রিকগনিশনের জন্য? আমরা যে এর কাজ নিয়ে আনন্দে মাতালের মতো দিনরাত কাটিয়েছি, এটাই ছিল আমাদের সবচেয়ে বড় রিকগনিশন। আমাদের তখন বই রাখার জায়গা পর্যন্ত ছিল না। কেন্দ্রের বই থাকত আমার বাসায়। একবার বাসায় এত বই জমে উঠল যে, বাড়ির মধ্যে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাওয়ার জায়গা হয় না। বাসাভর্তি শুধু বই আর বই। এক আর্কিটেক্ট এসে একদিন বলে গেল যে, এত বই থাকলে দুর্বল বিল্ডিংটার ক্ষতি হতে পারে। আমার গিন্নি একদিন রেগে বললেন, হয় বউ রাখো, নয় বই রাখো।

তো, এই যে পাগলের মতো আনন্দ-মাতাল সব দিনরাত্রি, চন্দ্রাহতের মতো ঘোরের মধ্যে সময় পেরিয়ে গেল, উন্মাদের মতো এই আনন্দমদির জীবনটা নেশার মৌতাতে উড়িয়ে দিলাম—এই থৈ থৈ আনন্দের পাশে ওই পুরস্কার আর রিকগনিশনের কী মূল্য বলুন?

আপনারা তো রবীন্দ্রনাথের *নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ* কবিতাটা পড়েছেন। দেখেছেন তো কবিতাটার আগাগোড়া কী প্রমত্ত আবেগে উত্তাল। যখন কেউ ওটা পড়ে তখন তার সারা শরীর-মন কেমন আবেগমত্ত হয়ে ওঠে!

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের ’পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত-পাখির গান!

ধরুন, আপনি সেই আবেগে উত্তাল হয়ে কোনো বিশাল মাঠের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে উদ্বেলিত হয়ে কবিতাটা আবৃত্তি করছেন। আর ওদিকে অনেক দূরে মাঠের অন্য পাশে দাঁড়িয়ে কেউ আপনাকে দেখছেন। দূরে থাকায় তিনি আপনার কথাগুলো শুনতে পাচ্ছেন না। শুধু দেখছেন, নিঃশব্দভাবে আপনার হাতটা আপনি থেকে থেকে শুধু ওপরের দিকে ছুড়ছেন। কী হাস্যকরই তার কাছে লাগবে তখন আপনাকে! তিনি নিশ্চয়ই ভাববেন, কী হলো রে লোকটার? শুধু পাগলের মতো আকাশের দিকে হাত-পা ছুড়ছে! উন্মাদ হয়ে গেল নাকি? আসলে আপনি তো পাগল হন নি।

একটা অসম্ভব আনন্দে আবেগে উত্তেজনাতে আপনি তখন উদ্বেলিত হয়ে রয়েছেন। এই যে আনন্দ, এই যে নিশিতে পাওয়া মানুষের মতো ঘোর-লাগা দিন, এই আনন্দই তো স্বীকৃতি। বাকি যা-কিছু তা তো কিছু ধাতুর চাকতি। আর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে গোটা কয়েক কড়কড়ে নোটের বান্ডিল।

তাই আমি মনে করি, জীবন একটা প্রজ্বলিত আনন্দের শিখা। এ হল একটা অতীন্দ্রিয় আনন্দের রমণীয় ঝড়। এ ঝড়ের ব্যাখ্যা কিংবা অনুভব একেক মানুষের কাছে একেক রকম। তবু কমবেশি এ ঝড় রয়েছে সবার মধ্যে। শুধু টাকা দিয়ে ওই জগতকে কেউ খুঁজে পাবে না। বরং টাকা যত বাড়বে ততই তা হারিয়ে যাবে।

তার মানে এই নয় যে, টাকা আমাদের লাগবে না। টাকা খুবই লাগে, ভালোমতো বেঁচে থাকতে হলে এর দরকার খুবই বেশি। কিন্তু এর মাত্রাটা বুঝতে হবে। তা না হলেই বিপদ। পৃথিবীতে সবকিছুরই একটা নির্দিষ্ট গণ্ডি আছে। সে গণ্ডির সীমানা পেরোলেই সর্বনাশ। সুন্দর কথা খুব ভালো জিনিশ, সুস্বাদু খাবারও তা-ই। ছোটখাটো সাধ-আহ্লাদও খুব কাম্য। কিন্তু এর যে-কোনোটা মাত্রাতিরিক্ত বা বেশি হয়ে গেলে এগুলোর চেয়ে কদাকার জিনিশ নেই। সুতরাং থামতে শেখো। বুঝতে চেষ্টা কর কতটুকুর পরে আর দরকার নেই।

মনে পড়ে রামায়ণে আছে, রাক্ষসরাজ রাবণ দণ্ডকারণ্য থেকে কীভাবে সীতাকে চুরি করল। রাবণ যখন সীতাকে চুরি করতে চাইল তখন সে একটা অপরূপ সোনার হরিণের বেশ ধরে তার সামনে দিয়ে ঘোরাঘুরি শুরু করল। সীতা অল্পবয়সী মেয়ে। সোনার হরিণ দেখে তিনি উতলা। স্বামীকে বারে বারে অনুরোধ করতে লাগলেন সোনার হরিণটাকে ধরে দেবার জন্য। স্ত্রীর ঐকান্তিক অনুরোধ, রাম কী করে ফেলেন? রাম ওটা ধরে আনতে গেলেন। সীতাকে পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব দিয়ে গেলেন ছোট ভাই লক্ষণকে।

কিন্তু রাম সোনার হরিণকে ধরবেন কী করে, ওটা তো একটা মায়া। সেই মায়া রামের মতো কণ্ঠ ধরে গভীর বনের ভেতর থেকে আর্তস্বরে চিৎকার করল, বাঁচাও ভাই লক্ষণ, আমি মরে যাচ্ছি। লক্ষণ তড়িঘড়ি গেল বাঁচাতে, যাওয়ার আগে সীতার চারপাশে একটা গণ্ডি এঁকে দিয়ে গেল। বলে গেল, যাই ঘটুক এই গণ্ডি তুমি কিছুতেই পার হয়ো না।

যেই লক্ষণ চলে গেল, তখনই রাবণ ব্রাহ্মণ জটাধারী সেজে সীতার কাছে এসে ভিক্ষা চাইতে এল। সীতা ওই গণ্ডির ভেতরে থেকেই ভিক্ষা দিতে চেষ্টা করল। কিন্তু রাবণ বলল, ওখান থেকে দিলে আমি নেব না। অভিশাপ দিয়ে চলে যাব। তুমি সবংশে নির্বংশ হবে। ব্রাহ্মণ ভিক্ষা না নিয়ে অভিশাপ দিলে তা মহাপাপ! ভয়ে সীতা ভিক্ষা দিতে যেই গণ্ডির ওপাশে পা রাখল, অমনি রাবণ তাকে ধরে লঙ্কার পথে পা বাড়াল।

আমাদের প্রত্যেকের চারপাশেও রয়েছে এমনি একটা করে গণ্ডি। ওটা পেরোলেই রাক্ষসের হাতে পড়তে হয়। সে এমনই পড়া যে, সারাজীবনের অশ্রু দিয়েও তার প্রতিকার হয় না। শুধু এটুকু বোঝেন না বলে বহু মানুষ অকারণে দুর্ভাগ্য ডেকে আনে।

শরৎচন্দ্রকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আমাদের লেখকদের লেখা সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী? তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের লেখকরা জানে না যে কতটুকু বলতে হবে না। লিখতে হলে তো কিছু বলতে হবেই। কিন্তু কোথায় থামতে হবে সেটা জানাতেই তো ভালো লেখকের পরিচয়।' জীবনেরও তা-ই।

একবার এক ওস্তাদ এসেছেন জৈনপুর থেকে। বিরাট ওস্তাদ। শরৎচন্দ্রের এক ভক্ত এসে বললেন—শরৎবাবু, এক অসাধারণ ওস্তাদ এসেছেন, বিস্ময়কর তার গান। শরৎচন্দ্র হুঁকো খেতেন। শুনে তিনি কুরুৎ কুরুৎ করে হুঁকো টেনে চললেন, কথা বললেন না। তাঁর এই নির্লিপ্ত ভাব দেখে ভক্ত অস্থির হয়ে বললেন, আপনি বুঝতে পারছেন না শরৎবাবু, কত বড় ওস্তাদ তিনি। শরৎবাবু যথারীতি হুঁকো টেনে চললেন, আগের মতোই নিরুত্তাপ। ভক্তের অস্থিরতা এবার চরমে উঠল। হাত-পা ছুড়ে ভক্ত বোঝাতে লাগলেন—কত অসাধারণ ওস্তাদ তিনি। কত অনিন্দ্য তাঁর গান, তা না শোনা কত বড় নির্বুদ্ধিতা। ভক্তের গর্জন শুনে শরৎচন্দ্র মুখ খুললেন। হুঁকোর কুরুৎ কুরুৎ থামিয়ে নির্লিপ্তভাবে জিগ্যেস করলেন, 'ওস্তাদ তো বড় বুঝলাম, কিন্তু থামে তো?' জীবনে সুখ-শান্তি বা ভালো কিছু পেতে হলে আমাদের ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় থামতে জানতে হবে। নয়ত সবই ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

আমাদের এই সুন্দর জীবন এমন অবিশ্বাস্য বলেই একদিন থেমে যাবে। আমরা যারা এই ঘরে এই মুহূর্তে বসে আছি তারা কেউই একদিন

থাকব না। ওমর খৈয়ামের একটি বিখ্যাত রুবাই আছে :

Ah, make the most of what we yet may spend,
Before we too into the Dust descend;
Dust into Dust, and under Dust into lie
Sans Wine, sans Song, sans Singer, and--sans End!

এসো প্রিয়তমা, ধুলার নিচে মুছে যাবার আগে তুমি আর আমি এ জীবনকে যতটা পারি উপভোগ করে যাই। কারণ একবার ধুলোর নিচে চলে গেলে এ সুযোগ আর থাকবে না। সেখানে ধুলোর নিচে ধুলো, তার নিচে ধুলো, তার নিচে আমাদের শুয়ে থাকতে হবে। সেখানে মদ নেই (মদ বলতে খৈয়াম জীবনের আনন্দকে বোঝাতেন), গান নেই, গায়ক নেই। আর সে অন্ধকারেরও শেষ নেই।

সুতরাং এই জীবনকে আমরা যখন একবার পেয়েছি, আমরা যেন একে কিছুতেই অপচয় না করি। জীবনে দুঃখ-মৃত্যু ব্যথা-দীর্ঘশ্বাস রয়েছে, কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে অপার্থিব আনন্দও তো রয়েছে। তাই বিষণ্নতা-হতাশায় নুয়ে পড়ে এই ছোট কিন্তু অবিশ্বাস্য জীবনটাকে হারিয়ে ফেলার কোনো মানে হয় না। মনে রাখতে হবে, জীবন কখনও সরলরেখায় চলে না। এ চলে ঢেউয়ের তালে।

অনেকসময় দেখবেন মাঠ বা লনের মাঝখান দিয়ে লোকজন হাঁটতে হাঁটতে পায়ে-চলা রাস্তা তৈরি করে ফেলে। খেয়াল করলে আপনারা দেখবেন, ওই রাস্তাগুলো কি সরলরেখা? না। কমবেশি আঁকাবাঁকা। দেখলে মনে হবে যেন জোছনা রাতে কোনো আধা-মাতাল কবি এখান দিয়ে হেঁটে চলে গেছে। জীবনও এরকম। এ কখনও সোজাসুজি নয়, কিছুটা আঁকাবাঁকা, ঢেউ খেলানো। কারণ এর প্রাণ আছে। মানুষের প্রাণ থেকেই সে প্রাণের জন্ম।

এই যে আমার সামনের মাইক্রোফোন, এ একটা যন্ত্র, এর প্রাণ নেই, সেজন্য দেখুন এটা কেমন অনড় হয়ে আছে। প্রাণ থাকলে হয়ত উৎসাহে বা খেদে এতক্ষণে এ আমার মতো নড়াচড়া শুরু করত। কিন্তু এ স্থির। হিমালয় পর্বত প্রাণহীন, এজন্য ও অচল আর চিরস্থবির। কিন্তু মানুষের সবকিছুই তো পরিবর্তমান। তাই এ সরলরেখা নয়। আঁকাবাঁকা। এ কখনও উঠবে, কখনও নামবে।

যখন জীবন ওঠে তখন তো গলা ছেড়ে বলে ওঠেন না—উঃ কী আনন্দ! এ বিস্ময় সওয়া যায় নাকো। কিন্তু নামার সময় কেন এমন অসুস্থ আর বিমর্ষ হয়ে পড়েন? ওঠার মতো নামাকেও কেন মন খুলে অভিনন্দন জানাতে পারেন না? এ দুটো তো একই জিনিশ।

নানা সময়ে আমার জীবনেও অনেক দুঃখ-কষ্ট এসেছে। কিন্তু কখনও ঠিক ডিপ্রেশন আসে নি। তাই আজও আমি ডিপ্রেশন কাকে বলে জানি না। ডিপ্রেশনে কষ্ট পাওয়া মানুষ অনেক দেখেছি। ডিপ্রেশনে বিরাট ক্ষতি হয় মানুষের। ডিপ্রেশন যত ক্ষতি করে সাধারণ দুঃখ ততটা ক্ষতি করে না; বরং দুঃখে মানুষ আরও সৃজনশীল হয়ে ওঠে। তাই তো দুঃখে মানুষ কবিতা লেখে। যন্ত্রণা হলে গান গায়। কিন্তু ডিপ্রেশন হলে মানুষ ভেঙে যায়। স্বপ্ন হারিয়ে ফেলে। তার উদ্যম উদ্যোগ ধসে পড়ে। তখন মানুষ বুঝতে পারে না, সে কেন বেঁচে থাকবে। সে কোন কাজে আসবে। তাই বাচ্চাদের বেশি বকাবকি করতে নেই। বেশি অপমান করতে নেই। অত্যাচার নিগ্রহ ওদের জন্য নয়। অপমান-অমর্যাদা করতে থাকলে তাদের আত্মমর্যাদাবোধ আস্তে আস্তে ধ্বংস হয়ে যায়। ওরা নিজের কাছে ছোট হয়ে পড়ে। ওদের লজ্জা বা সম্মানবোধ নষ্ট হয়ে যায়।

যুদ্ধে যাবার মুহূর্তে সৈনিক কি মরতে চায়, না পালাতে চায়? আসলে সে পালাতে চায়। কারণ জগতে কে-ই বা জীবন হারাতে পছন্দ করে? কিন্তু তার অহংবোধ, তার আত্মমর্যাদাবোধ তাকে পালাতে দেয় না। তার মনে হয়, আমার সব সহযোদ্ধা জীবনপণ করে এগিয়ে চলেছে। আমি সেখান থেকে চোরের মতো পালিয়ে যাব? সবার রক্তের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করব? তাই মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও মানুষ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। মরলেও বীরের মতো মরে, সে তার নিজের অহংবোধ বা সম্মানকে কোনোভাবে পরাজিত দেখতে চায় না। ডিপ্রেশন এলে মানুষ অহংকে হারিয়ে ফেলে। তখন সে কেন বেঁচে আছে, কেন ঘুরে দাঁড়াবে, কেন জীবনকে তার আদৌ দরকার—সব বোধ সে খুইয়ে বসে।

আমাদের দেশে আমরা কিন্তু মানুষের ওপর অসম্ভব অত্যাচার করি। কারণে-অকারণে তাদের ছোট করি। আমাদের স্কুলগুলোর অনেক শিক্ষক ছাত্রদের নানারকম শাস্তি দেন, অনেকসময় তাতে আত্মমর্যাদা পুরো নষ্ট করে দেন। আমাদের স্কুলে এক স্যার ছিলেন, তাঁকে যদি

ছাত্ররা কেউ কোনো প্রশ্ন করত, তিনি সঙ্গে সঙ্গে উল্টো প্রশ্ন করতেন– বাড়ি কোথায়? ছাত্র যদি বলত–নোয়াখালী; সাথে সাথেই তিনি সর্বজ্ঞের হাসি হেসে মন্তব্য করে উঠতেন–ও! এই জন্যই। সবাই হো হো করে হেসে উঠত। আমাদের দেশে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে, পরিবারে, কর্মক্ষেত্রে প্রায় প্রত্যেকটা জায়গায় প্রতি মুহূর্তে মানুষকে ছোট করা হয়। 'তুই কে, তুই কী, তুই কেন, তুই কিছু না, তুই আসলে একটা ... মানে তুই একটা তুই!' ... এইসব কথাবার্তা সবখানে। তার ফলে আমাদের অধিকাংশ মানুষ যে যার জায়গায় ছোট হয়ে মরে থাকে।

বিশ্বের প্রতিটা এয়ারপোর্ট দিয়ে ভ্রমণ করে দেখবেন, নিজেকে রাজার মতো লাগবে। কিন্তু আমাদের এয়ারপোর্টে মনে হবে অন্যরকম। সবাই এমন চোখে তাকাবে যেন মনে হবে বলছে, কে ঢুকল রে ... কী নিল রে ... ধর রে ... বাঁধ রে ... । এমনই অপমান সবখানে।

এভাবে সব জায়গায় ছোট হতে হতে আমাদের আর বিশেষ কিছু থাকে না। কোনো অনুষ্ঠানে সামান্য একটা ক্যামেরার সামনে কথা বলতেও আমাদের জিভ শুকিয়ে যায়, মনে হয় যেন সবকিছু সরে যাচ্ছে পায়ের নিচ থেকে। আত্মবিশ্বাস এমনভাবে হারিয়ে যায় যে, ছোট্ট তুচ্ছ ব্যাপারেও আমরা অক্ষম হয়ে পড়ি।

সমাজের সবখানে এমনি এক আত্মঘাতী নেতিবাচকতা। শুধু সমালোচনা আর নিন্দা। সবাইকে ধ্বংস করার একটা অশুভ পাঁয়তারা সবসময়। এদেশে অধিকাংশ মানুষ নিজে কিছু করছে না। করার ক্ষমতাও নেই। সুতরাং অন্যের সাফল্যকে সে কী করে সহ্য করবে? আমার পাশেরজন এত সব করে ফেলল, আর আমি যেই কে সেই। এ কি সহ্য করার মতো?

একবার টেলিভিশনে গোপাল ভাঁড়ের একটা গল্প বলেছিলাম। আপনারা জানেন, গোপাল ছিল মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজভাঁড়। তখনও রাজার দরবারে ভাঁড়ের এই চাকরি তাঁর হয় নি। একান্তই গরিব। একটা জরাজীর্ণ কুটিরের মধ্যে থাকে। ঠিক সে সময়ে তার ঠিক পাশের বাড়ির প্রতিবেশী লোকটা নানা ফটকাবাজি করে কীভাবে যেন একটা একতলা বাড়ি বানিয়ে ফেলেছে। বানানো শেষ হলে লোকটা বাড়ির ছাদে উঠে গোপালের ভাঙাচোরা বাড়ির দিকে মাথা নিচু করে তাকিয়ে জিগ্যেস

করল, গোপাল কেমন আছ? এই বিদ্রূপের কী উত্তর দেবে গোপাল! সে তার জীর্ণ কুটিরের মধ্যে চুপ করে বসে রইল।

এরপর একসময় রাজদরবারে গোপালের চাকরি হল। ভালো বেতন। রাজা তাকে মাঝেমধ্যে এটা-সেটা ইনাম বখশিশও দেন। এরকম করতে করতে বছর পাঁচেকের মধ্যে সে একটা দোতলা বাড়ি বানিয়ে ফেলল। বানানো শেষ হলে দোতলার ছাদের ওপর উঠে গোপাল মাথা নিচু করে পাশের একতলার দিকে তাকিয়ে একইভাবে বলল, ভালো আছি।

দেখুন, গল্প দুটোর প্রতিটিতেই একজন আরেকজনকে অপমান করছে। কেন? আমাদের সেই নেতিবাচক মানসিকতার জন্য। এ থেকে আজ আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে নিজেদের চেষ্টায়। কেউ এসে এটা করে দেবে না।

আজ একটা স্বাধীন জাতি আমরা। ত্রাণকর্তার মতো এসে কেউ আজ আর আমাদের উদ্ধার করবে না। যা করার তা আমাদেরই করতে হবে। প্রথম এ শুরু করতে হবে নিজেকে দিয়ে। তারপর আস্তে আস্তে অন্যদেরকে এর মধ্যে জড়িয়ে ফেলতে হবে। চলুন না আমরা সবাই সবাইকে বলি, আমরা সবাই মিলে এগিয়ে যাই। আমরা যদি সবাই সবাইকে ভালোবাসি, সম্মান করি, সাহায্য করি–আমরা একদিন নিশ্চয়ই সব পারব।

ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি, এই বাংলাদেশ একদিন পৃথিবীর প্রথম সারির দেশ হবে। আমরা চিন্তাশীল জাতি। আমাদের বুদ্ধি ক্ষুরধার, উদ্ভাবনী শক্তি বিস্ময়কর। আইডিয়া সৃষ্টির ক্ষমতা আমাদের অসাধারণ। একসময় বলা হত, হোয়াট বেঙ্গল থিংকস টুডে, ইন্ডিয়া থিংকস টুমরো। আজ হয়ত আমাদের কিছুটা দুঃসময় যাচ্ছে। আমরা রাজনীতি নিয়ে বিপাকে পড়েছি। যে জাতি কোনোদিন স্বাধীন ছিল না, নিজেদের শাসনভার নিজেরা পরিচালনা করে নি, প্রথম রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদের পক্ষে এ ধরনের ভুলভ্রান্তি হওয়া বিচিত্র নয়। সোজা হয়ে বসতে তো সময় লাগে। আমরা আজ যা যেভাবে করতে চাইব, তা সেভাবেই হবে। সুতরাং আমাদের আজ বিশ্বাস করতে হবে যে, আমরা পারব।

রাষ্ট্র মানে শুধু একটি পতাকা নয়। রাষ্ট্র মানে একটি সংবিধান, একটি জনগোষ্ঠী এবং সেই জনগোষ্ঠীর প্রতিটা মানুষের সুখ নিশ্চিত হওয়ার

লক্ষ্যে নির্মিত আইনের একটি নিশ্ছিদ্র জাল। আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, অনেক প্রতিকূলতা উজিয়েও রাষ্ট্রের আইনকানুনগুলো আজ তৈরি হচ্ছে। রাষ্ট্র সংহত হচ্ছে। সেই আইনের প্রয়োগও নিশ্চিত হবে সময়ের পথ ধরে। একদিনে সব হবে না, কিন্তু হবে। আইন নিশ্চক্ষু। তার কাছে উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ নেই। আইনের এই চেহারা দেখা যায় উন্নত দেশগুলোয়।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশ এমন একজন পরাক্রান্ত লোক, কিন্তু অপ্রাপ্তবয়সে মদ্যপান করায় তার মেয়েও আইনের হাত থেকে রেহাই পায় নি। তাকে জরিমানা দিতে হয়েছে। ইংল্যান্ডের রাজপুত্র প্রিন্স চার্লসকে বেশি স্পিডে ড্রাইভ করার জন্য ফাইন দিতে হয়েছে। ইংল্যান্ডের রানির গাড়িকে পর্যন্ত ফাইন করা হয়েছে ঠিকমতো গাড়ি-পার্কিং না করার জন্য। এসবের কোনো ক্ষমা নেই ওসব দেশে। কিন্তু যে যত বড় দুর্বৃত্ত আমাদের দেশে তার জন্য তত ক্ষমা। সে তত মুক্ত। আইনকে তাচ্ছিল্য করার অধিকারও তার তত বেশি।

এ অবস্থার একদিন পরিবর্তন হবে। এটা সময়ের ব্যাপার। প্রত্যেক অঙ্গনে একটা সুষ্ঠু আইনের শাসন গড়ে উঠবে। আমি মনে করি, এ প্রক্রিয়াটা সুসম্পন্ন হতে হয়ত আরও ২০, ৩০ বা ৫০ বছর সময় নেবে। আমরা মোটামুটিভাবে একটা ন্যায়বিচারসম্পন্ন সুষ্ঠু বাংলাদেশ পাব– যে বাংলাদেশ আরও বড়-র অভিমুখী।

তার মানে কিন্তু এই না যে, এখন কিছুই হচ্ছে না। এখন কালের কুজ্ঝটিকার মধ্যে চোখে না পড়লেও এ যুগে অনেক ভালো কাজ হচ্ছে। সময়ে তা দেখতে পাব। তবে কথা একটাই–আপনারা বিশ্বাস রাখুন। আশা রাখুন। আশা করতে হবে। আশা যে-কারণে খুব গুরুত্বপূর্ণ, তা হল, সত্যিকার আশা বাস্তব হয়ে যায়। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সব আশাই বাস্তবায়িত হয়েছে। তাহলে আশা নয় কেন? আশা মানেই তো অগ্রযাত্রা। আশা মানেই তো সৃষ্টি। আশাই তো বেঁচে থাকা। আশা মানেই তো জীবন। তাই যে যত আশা করেছে সে তত সামনে গিয়েছে।

আগের কথাটাতে আবার ফিরে আসি। আসুন, আমরা এই অপরিমেয় মানবজীবনটাকে সুপ্রচুরভাবে ব্যবহার করি, একে পরিপূর্ণ করি–যাতে জীবনের শেষে এক অপার্থিব আনন্দের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা বিদায়

নিতে পারি। রবীন্দ্রনাথের গানে আছে–

এই করেছ ভালো, নিঠুর হে, এই করেছ ভালো।
এমনি ক'রে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো ॥
আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে দেয় না কিছুই আলো ॥

ধূপ এমনি পড়ে থাকলে কি গন্ধ ছড়ায়? প্রদীপ কি এমনিই আলো দেয়? কী করতে হয়? এদের বুকে আগুন লাগিয়ে দিতে হয়। সুতরাং আগুন লাগাও। কীসের আগুন? কাজের আগুন। প্রেমের আগুন। ইচ্ছার আগুন। আত্মোৎসর্গের আগুন। সারাক্ষণ নিজেকে ব্যস্ত রাখো। ঐ যে গুরুজী বসে আছেন, তার মতো পরহিতৈষিতার আগুন লাগাও। এ বয়সে এত আনন্দ তাঁর কোত্থেকে আসে? চোখের এই স্বাপ্নিক দৃষ্টি কীভাবে জন্মায়? অন্তহীন নিদ্রাহীন আনন্দময় কাজ থেকে। কাজের আনন্দে তাঁর মন ভরে আছে। তাই তিনি অমন একাগ্রভাবে জ্বলছেন। গোলাপের মতো পাপড়ি মেলে আছেন। বয়সের আগ্রাসন তাঁকে বিপর্যস্ত করতে পারে নি।

কিন্তু আমাদের অধিকাংশেরই কী হয়? আমরা কি আগুন লাগাই? লাগাই না। ফলে কী হয়? কাঠটা ছাই হয় না। ধূপটা গন্ধও দেয় না। অব্যবহৃত অদগ্ধীভূত অবস্থায় পড়ে থাকে। পড়ে থেকে থেকে একসময় শেষ হয়ে যায়। সুতরাং সেই মানুষই সত্যিকারের সুখী, যে কাজের মধ্য দিয়ে জীবনের অগ্ন্যুদ্‌যাপন করতে পারে। স্বপ্নের বাস্তবায়ন করে।

মানুষের মধ্যে উচ্চতর স্পৃহা তখনই আসে, যখন তার মধ্যে কোনোকিছু নিয়ে বড় কোনো বেদনার জন্ম ঘটে। তাই আসুন, আমরা আমাদের চারপাশে ভালো করে তাকাই–দেখি কোথাও কোনো বেদনার অবসান আমাদের উদ্যমের জন্য অপেক্ষা করে আছে কিনা।

কত রকম দুঃখ আমাদের চারপাশে! দারিদ্র্যের দুঃখ, অজ্ঞতার দুঃখ, নৈরাশ্যের দুঃখ, বৈষম্যের দুঃখ। আসুন দেখি, কোন দুঃখটা আমাকে সবচেয়ে বেশি বিচলিত করছে। দেখে বুঝে সেই দুঃখের জবাব দিতে কাজ শুরু করি। এভাবে কাজ করতে থাকলে, সে কাজের মধ্যে জ্বলতে থাকলে, আমরাও হয়ত একসময় অমনি সৌন্দর্যের গন্ধ বিলাব। দেখব আমরা আলো ছড়াচ্ছি চারিদিকে। প্রদীপের মতো আলো।

কাজ মানে ইবাদত। যারা কাজের মধ্যে থাকে, দেখবেন, তারা সুস্থ সজীব থাকে। তাদের মন থাকে পবিত্র, বৃষ্টি ধোয়া। কাজের একটা খুবই ভালো দিক আছে। কাজ করার সময় আনন্দ আর উদ্ভাবনার মধ্যে মন এতটা ডুবে থাকে যে, অন্য কিছু তখন মাথায় আসার সুযোগ পায় না।

ইংরেজিতে একটা কথা আছে, Idle brain is devil's workshop. কাজ করলে মনটা ওই শয়তানের খপ্পর থেকে দূরে থাকে। নিজের ভেতর মাকড়সার জটিল জালের অসুস্থ আবর্ত তৈরি হতে পারে না। নিজের সঙ্গে নিজের যুদ্ধ থাকে না। মন থাকে সহজ সজীব আনন্দময়। ভলতেয়ারের সঙ্গে স্বর মিলিয়ে তাই বলি : আসুন আমরা 'বাগান করি।' নিজের ও সবার আনন্দের জন্য।

চাই আত্মশক্তি

স্যার, আপনার অনেকগুলো পরিচয় আমরা জানি। আপনার প্রধান পরিচয় আপনি এমন একজন শিক্ষক, যিনি শিক্ষকতাকে ভালোবেসেছেন পুরো সত্তা দিয়ে। এর প্রেরণা কী?

● ভেবে দেখ, শিক্ষক কে? তাঁর কাজ কী? আমার ধারণা, শিক্ষক একজন জীবন-জাগানিয়া। তাঁর কাজ হচ্ছে জীবনের উন্মোচন, প্রস্ফুটন—মানুষের ভেতরে যে শক্তি, উদ্যম আর সম্ভাবনা আছে তাকে বিকশিত করা। আমি সারাজীবন এ কাজটিই করার স্বপ্ন দেখেছি।

যখন কলেজে ছাত্র পড়াতাম তখন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জীবনের সমৃদ্ধি দেখে বিস্মিত হতাম। দেখতাম কী অবিশ্বাস্য দ্যুতি এককেজনের ভেতরে! সেই দীপ্তিকে কী করে আরও পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় তা নিয়ে আমি ক্ষান্তিহীন ছিলাম। এই তরুণদের সঙ্গেই সারাজীবন আমি থেকেছি, কাজ করেছি—এককথায় জীবনটাকে উদ্‌যাপন করেছি। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের নানা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে আজও তা-ই করি। আমি প্রতিমুহূর্তে নিজেকে শিক্ষক ভেবে আনন্দ ও গৌরব অনুভব করি। বেঁচে থাকার উৎসাহ পাই।

ষাটের দশকে আপনি সাহিত্য পত্রিকা 'কণ্ঠস্বর' সম্পাদনা করেছেন। এটা আমাদের সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা নতুন ধরনের বিপ্লব কিংবা শিল্পের জগতে একটা ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ। আমরা জানি, সে-সময়ে তরুণ সমাজেধর যে

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : রাবিয়া নাজরীন, জুলাই ২০১০

অংশটা সাহিত্য নিয়ে নতুন কিছু করতে চাইত, ভিন্নভাবে ভাবত, তারা ছিল এই পত্রিকাটির লেখক। পত্রিকাটির ভক্ত-পাঠকেরা অপেক্ষায় থাকতেন কখন এর নতুন সংখ্যাটি বেরোবে। এই সাহিত্য আন্দোলনের সাথে আপনার সম্পৃক্ততার ব্যাপারে কিছু বলুন।

● ষাটের দশকে আমরা তরুণ লেখকেরা যখন সাহিত্যের অঙ্গনে পা রাখলাম–তখন আমাদের সামনে একটাই স্বপ্ন : নতুন কিছু করতে হবে। মনে হত, একটা নতুন সাহিত্যযুগের সামনে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি। এর জন্য আমাদের অনেক দায়িত্ব, অনেক কাজ, অনেক কর্তব্য। মূলত এ ভাবনা থেকেই সে-সময়কার তরুণ লেখকরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিলাম। আমি নিজেও সেখানে একটা ভূমিকা রেখেছি। সেই তরুণ সম্প্রদায়ের সাহিত্য মুখপত্র *কণ্ঠস্বর*-এর সম্পাদক ছিলাম আমি। আমাদের সঙ্ঘবদ্ধতায়, আসা-যাওয়ায়, বেপরোয়া উৎসাহ আনন্দে পুরো পরিবেশটা জমজমাট হয়ে থাকত। লেখকদের তো এরকমই হওয়া উচিত। এরকম তরুণ, তরতাজা, উদ্দাম, স্বতঃস্ফূর্ত। সে-সময়টা আমাদের জন্য ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা প্রায় সবাই কাছাকাছি চিন্তা-চেতনায় আলোড়িত। সবাই আমরা বন্ধু হয়ে একসঙ্গে বাঁচব, একসঙ্গে সংগ্রাম করব, জিতব, সাহিত্যের পালাবদল ঘটাব–এই ছিল তখন আমাদের স্বপ্ন।

সেই সঙ্ঘবদ্ধতার উত্তাল উন্মাদনা এরপর আমাদের সাহিত্যে আর দেখা যায় নি। শুধু সাহিত্যজগৎ কেন, প্রায় কোথাও এমনটা সেভাবে আর হয় নি। কিন্তু এখন থেমে গেলেও বিশ্বাস করি, সে ঢেউ আবার আসবে। নতুন প্রজন্ম, নতুন তারুণ্য অপেক্ষা করছে। কবে আসবে জানি না। কিন্তু বিশ্বাস করি আসবে। যুগে যুগে বারে বারে আসবে। আমাদের চেয়ে অনেক বেশি শব্দিত উদ্দাম জীবন-স্পন্দন নিয়ে দেখা দেবে।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রসঙ্গে আসি। আপনার একটা লেখায় পড়েছি–এ কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠার আগে আপনার উদ্দেশ্য ছিল সত্যিকার জাতীয় উন্নতি ঘটাতে পারবে এমন কিছু সম্পন্ন মানুষ গড়ে তোলার চেষ্টা করা। দেশের সার্বিক অবক্ষয় আর ঊষরতার মধ্যে সীমিত সংখ্যায় হলেও শিক্ষিত এবং উঁচু মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ তৈরি করার একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা। এ ব্যাপারে আপনার চিন্তাভাবনা কী ছিল সে-সময়ে?

● ষাটের দশকের লেখকদের নিয়ে সাহিত্য আন্দোলন করার সময় একটা ব্যাপার আমাকে খুব কষ্ট দিত। আমাদের লেখকদের অধিকাংশই খুব প্রতিভাবান এবং ত্রিশের যুগে কোলকাতাকেন্দ্রিক সাহিত্য আন্দোলনের প্রধান দু-একজন লেখককে বাদ দিলে বাকিদের চাইতে শক্তিতে খুব একটা কম নয়। কিন্তু একটা জায়গাতে তাদের চেয়ে আমরা পিছিয়ে পড়লাম। পিছিয়ে পড়লাম পটভূমির সীমাবদ্ধতার জন্য। মনে হল, ত্রিশের সাহিত্যের প্রধান লেখকরা যেখানে জন্মেছেন বিশ্বসাহিত্যের পটভূমি থেকে, সেখানে আমাদের লেখকরা জন্মেছেন বাংলা সাহিত্যের পটভূমি থেকে। আর এখানেই আমরা যেন কিছুটা সীমিত হয়ে পড়েছি।

আমার তখন মনে হয়েছিল, সাহিত্যকে বড় শক্তিতে প্রজ্বলিত করতে হলে জ্ঞান দরকার। বিপুল গভীর পেশিবহুল জ্ঞান। আমাদের জাগতে হবে বিশ্বসাহিত্যের পটভূমি থেকে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটাকে আরও বড়, আরও প্রসারিত করতে হবে। না হলে উচ্চতর সমৃদ্ধির জায়গাতে আমরা বারে বারে হেরে যাব। মূলত এই ধারণা থেকেই ১৯৬৮ সালে আমি কিছু মেধাবী ছাত্র নিয়ে একটা পাঠচক্র আরম্ভ করি। কিন্তু বেশি দূর এগোতে পারি নি। এর পরপরই ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় দেশ জেগে উঠল। তারপর এল মুক্তিযুদ্ধ। এসবের ঝোড়ো তাণ্ডবে আমাদের সেই পাঠচক্র উড়ে ঝরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

এরপর দেশ স্বাধীন হল। আমরা ভাবলাম সোনার বাংলা পেয়ে গেছি। আমাদের এখন আর কিছুই করতে হবে না। এখন ঘরে শুয়ে ভালোমতো একটা ঘুম দিলেই সব হয়ে যাবে। কিন্তু একসময় টের পেলাম, সোনার বাংলা বলে কিছু নেই। আমাদের যে বাংলা—সে মাটির, সে কাদার। আমাদের কষ্টে, চেষ্টায়, শ্রমে, সংগ্রামে সেই কাদামাটিকে সোনার বাংলায় পরিণত করতে হবে।

আমি সাহিত্যের ছাত্র। তাই প্রথমে ভেবেছিলাম, শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিছু অর্থপূর্ণ মানুষ তৈরি করলেই জাতির মুক্তি ঘটবে। কিন্তু দেশের সে সময়কার সার্বিক অবক্ষয় দেখে মনে হল, শুধু সাহিত্য নয়, জাতীয় জীবনের সব অঙ্গনে যোগ্য এবং সম্পন্ন মানুষ আমাদের দরকার, যাদের আমরা এখন 'আলোকিত মানুষ' বলি। সেই মানুষদের নেতৃত্ব না হলে আমাদের দেশ বড় কোনো দিকে এগোবে না। তখন থেকে আমরা

একটা সামগ্রিক জাগরণের কথা চিন্তা করতে শুরু করি। এই চিন্তা থেকেই আবার আটাত্তর সালে নতুন করে একটা পাঠচক্র আরম্ভ করি। এভাবেই আমাদের যাত্রা শুরু এবং তা এখনও অব্যাহত আছে।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের শ্লোগান 'আলোকিত মানুষ চাই।' আলোকিত মানুষের সংজ্ঞা আসলে কী?

● আলো কোথা থেকে আসে? আলো আসে আগুন থেকে। সেই আগুন যার মধ্যে থাকবে, সে-ই আলোকিত হবে। প্রত্যেকের মধ্যেই আছে এই আগুনের সম্ভাবনা। কিন্তু একটা যোগ্য দেশলাইয়ের অভাবে তা জ্বলে উঠতে পারে না। আমরা বুঝতে পারলাম, সবার মধ্যেই যদি এই আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে প্রত্যেকের মধ্যেই আলো বাড়ছে। যার পাঁচ আছে তার ২৫ হবে। যার ২৫ আছে তার ৭৫ হবে। এভাবে সারা জাতির ভেতর তা বেড়ে চলবে।

সুতরাং আমাদের চাই আগুন। এই আগুন ন্যায়ের আগুন, প্রেমের আগুন, পরার্থের আগুন, স্বপ্নের আগুন, সৌন্দর্যের আগুন। যে মানুষের মধ্যে এই আগুন যত বেশি, সেই মানুষ তত আলোকিত। আজকাল আমাদের 'আলোকিত' শব্দটা অনেকেই ব্যবহার করে। তাতে বুঝি, দেশের সবাই আজ আলোর গুরুত্ব অনুভব করছে। মানুষ যা প্রয়োজন বলে বোধ করে, তা মানুষ একদিন অর্জনও করে। আমি বিশ্বাস করি একদিন আমাদের জাতি এই আলো অর্জন করবে।

আলোকিত মানুষ গড়ার কর্মসূচি হিসেবে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের একটা উল্লেখযোগ্য অবদান হল আমাদের দেশের তরুণ প্রজন্মকে বই পড়তে উদ্বুদ্ধ করা। এই আইডিয়াটা কেন এল?

● রবীন্দ্রনাথের একটা গান আছে–

এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর!
পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হলো অন্তর সুন্দর হে সুন্দর॥

কথাটার মানে হল, হে সুন্দর, আমি তোমার সঙ্গ পেয়েছি, তাই আমি সুন্দর হয়ে উঠেছি। অর্থাৎ সুন্দর হতে হলে সুন্দরের সঙ্গ পেতে হবে।

বড় হতে হলে বড়-র। যেমন : এই মুহূর্তে আমরা এখানে এই ছোট্ট ঘরটার ভেতর বসে আছি। কিন্তু এখানে না থেকে এই মুহূর্তে যদি আমরা চলে যেতে পারতাম কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতের বিশাল নীল জলরাশির সামনে, তাহলে কি আমরা হুবহু এই মানুষটিই থাকতাম? নিশ্চয়ই না। নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে আরও বড় কিছু এসে ভিড় করত। সেটা হল সেই বিশাল নীল সমুদ্রের অন্তহীনতা। ফলে আমরা আমাদের চাইতে বড় হয়ে যেতাম।

কিংবা যদি দাঁড়িয়ে থাকতাম দিগন্তবিস্তৃত কোনো মরুভূমির মাঝখানে বা বিশাল হিমালয় পর্বতমালার সামনে! তাহলে আমরা কি এই আমরাই থাকতাম? কাঞ্চনজঙ্ঘার বা এভারেস্টের সেই শুভ্র অভ্রভেদী অন্তহীন বিশালতা কি আমাদের আরও বড় করে তুলত না? তাই বড় হতে হলে বড়-র কাছে যেতে হবে। বই একটা বড় জিনিস। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষদের আত্মার আলো এর ভেতর জ্বলছে। উজ্জ্বলতম মানুষদের সৌন্দর্য আলো স্বপ্ন আনন্দ বোধ উপলব্ধি—সব রয়েছে বইয়ের মধ্যে।

আমাদের ধর্মগ্রন্থগুলোও তো সব বই-ই। বইয়ের মধ্যেই রয়েছে মানুষের যত গভীর অনুভূতি আবেগ মনন উপলব্ধি আর যত বিজ্ঞান দর্শন কবিতা। সেই আলো যদি আমরা মানুষকে বা আমাদের তরুণ-তরুণীদের মনের ভেতরে ছড়িয়ে দিতে পারি, তবে তাদের মধ্যেও বড় আর অমেয় কিছু জন্ম নেবে। এই স্বপ্ন থেকেই আমরা বই পড়াকে আমাদের মূল কর্মকাণ্ড হিসেবে বেছে নিয়েছি।

তার মানে এই নয় যে, শুধু বই পড়লেই সব হয়ে যাবে। আরও অনেক কিছু আছে পৃথিবীতে। একজন মানুষকে আলোকিত হতে হলে তাকে সৌন্দর্যের কাছে যেতে হবে। আলোর কাছে যেতে হবে। কবিতা গান চিত্রকলা মেঘ নদী পূর্ণিমা রাত্রির কাছে যেমন যেতে হবে, তেমনি যেতে হবে মানবসভ্যতার মহৎ বিস্ময়গুলোর কাছে। তাকে মানুষের দুঃখের কাছে যেতে হবে। সেই দুঃখের জবাব দেয়ার ক্ষান্তিহীন প্রয়াস চালাতে হবে। সংগ্রাম আর আত্মোৎসর্গ করতে হবে। এমন বহুরকম করণীয় আছে মানুষের, যা সম্পূর্ণ করলে সে হয়ে ওঠে উচ্চায়ত মানুষ। আমরা অন্তত বই দিয়ে শুরু করেছি। আস্তে আস্তে সবকিছুই আমাদের কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসছি।

আপনি অনুভব করেছেন যে, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার জন্য প্রয়োজন অসংখ্য উচ্চায়ত মানুষ। কোয়ান্টামও সেটাই বিশ্বাস করে। গত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে 'আলোকিত মানুষ চাই' আন্দোলনের অগ্রযাত্রী হিসেবে আপনি সংগ্রামরত আছেন। এরই ধারাবাহিকতায় আপনি জানেন–গত ২৫ বছর ধরে কোয়ান্টামও আলোকিত মানুষ গড়ার স্বপ্ন ও প্রত্যয় নিয়ে কাজ করে চলেছে। কোয়ান্টামকে যতটুকু দেখেছেন, শুনেছেন, পড়েছেন তার ভিত্তিতে কীভাবে এর মূল্যায়ন করবেন?

● যতটুকু বুঝতে পারি কোয়ান্টামের মূল কাজ এক ধরনের মানবিক শুশ্রূষা। যে মানুষ জীবনের ওপর আস্থা হারিয়েছে, ভেঙে পড়েছে, মাটি থেকে উঠে দাঁড়াতে পারছে না, দাঁড়াতে যে পারবে সে বিশ্বাসও হারিয়ে ফেলেছে, তাকে জীবনের আস্থা আর বিশ্বাসের ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দেওয়াই কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য। একটা সুস্থ বাসযোগ্য ও শান্তিময় পৃথিবী গড়ে তোলাই এর কাজ। মানুষ জীবনের পদে পদে বহু নিষ্ঠুর আক্রমণের শিকার হয়। নানান বৈরী ঘাত-প্রতিঘাতে দুর্বল হয়ে যায়। হারিয়ে ফেলে জীবনের ইতিবাচকতা ও উদ্যম। টি. এস. ইলিয়টের একটা কবিতার লাইন মনে পড়ছে। তিনি লিখেছেন–

Flesh and blood is weak and frail,
Susceptible to nervous shock;

মানুষ, সে যত শক্তিমানই হোক, নার্ভাস শক বা স্নায়বিক আক্রমণ তাকে দুর্বল করে ফেলতে পারে। যে-কোনো মানুষেরই এমন হতে পারে। এইসব মুহূর্তে আমাদের কিছুটা বাড়তি শক্তির দরকার হয়। কোথা থেকে আসবে এই শক্তি? প্রিয় মানুষদের উৎকণ্ঠা, অনুরোধ, উপদেশ, ডিসপেনসারি-ভরা ওষুধ কোনোকিছুই সে-সময় তাকে এ অন্ধকার থেকে বের করে আনতে পারে না। এ সময় বাঁচাতে পারে একটা জিনিশ– সহৃদয়, মমতাভরা যুক্তিপূর্ণ কথা, মানসিক প্রশান্তি আর মনঃসংযোগ, যা তাকে তার অসহায় জায়গাটাকে চিনিয়ে আত্মশক্তি ও বিশ্বাসে জাগিয়ে তুলতে পারে। কোয়ান্টাম এই শক্তির জোগানটুকু দেয়। আমার ধারণা, দেশের অসংখ্য পথ হারানো মানুষ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের ভেতর আশার আলো খুঁজে পেয়েছে।

কিছুদিন আগে আমি কোয়ান্টামের কোর্সে কিছুটা অংশ নিয়েছি। সেখানে জনাব শহীদ আল বোখারীর কথা শোনার সুযোগ হয়েছে। কী সুন্দর কথা বলেন তিনি! কীরকম বাস্তবনির্ভর, যুক্তিপূর্ণ, সূক্ষ্ম ও পরিচ্ছন্ন হাস্যরসে ভরা। অমন অনিন্দ্য কথা শুনলেই তো যে-কেউ সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। এরপর এই কথা দিয়ে তিনি করেন এক আশ্চর্য জিনিশ। শ্রোতাদের জীবনের ভেতর যেসব জায়গা ভেঙে বা দুমড়ে গেছে, সেগুলোর ওপর আলো ফেলে ফেলে তাদের ধরিয়ে দেন কোথায় কীভাবে তাদের জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এরপর বিভিন্ন গল্প আর উপমা দিয়ে তাদের হৃদয়কে জাগিয়ে তুলে হ্যামিলনের বংশীবাদকের মতো সে অতল থেকে তাদের তুলে আনেন। এই যে তাঁর অসম্ভব ক্ষমতা–এর ছোঁয়া যাদের হৃদয়ে লেগেছে, তাদের প্রায় সবার মধ্যেই একটা জাগরণ ঘটতে আমি দেখেছি। আমার নিজের মধ্যেও এটা হয়েছে।

মাঝখানে বেশ কড়া একটা অসুখ হয়েছিল আমার। পর পর দুবার। তখন আমার বয়স ৭১/৭২। এটা আমার সহজাত আত্মশক্তিকে বেশ কিছুটা ধ্বংস করে দিয়েছিল। আমি দুর্বল হয়ে কিছুটা নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম। আমি প্রথমে ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারি নি। প্রথমে ভেবেছি বার্ধক্য। বৃদ্ধ হয়ে গেছি বলেই হয়ত এমনটা হয়েছে। বৃদ্ধরা যেমন নিষ্ক্রিয় অবসন্ন বা বিমর্ষ হয়ে ঝিমায়, এ-ও হয়ত তেমনি। আমি ধরে নিয়েছিলাম এ আমার নিয়তি। এভাবেই জরার আক্রমণে বয়স্ক মানুষদের মতো একসময় শেষ হব। ভেবেছিলাম এটাই আমার হবার কথা ছিল এবং তা-ই হয়েছে। ফলে আমি এর কাছে কিছুটা আত্মসমর্পণ করে বসেছিলাম।

কিন্তু তাঁর প্রথম দিনের প্রথম বক্তৃতার ভেতরেই আমি এমন কিছু তথ্য পেলাম, যা থেকে স্পষ্ট হল এটা বার্ধক্যের কারণে ঘটে নি। এ ঘটেছে আমার মধ্যে ইতিবাচকতা ও আত্মশক্তির অভাবের ফলে। নেতিবাচকতা আমার হৃদয়ের দখল নিয়ে নিয়েছে। আসলে রোগের ক্লান্তি আর অবসন্নতা আমার ভেতরকার অন্ধ জীবনীশক্তিকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল। আমার মধ্যে একটা দ্বিধা, ভীতি আর আত্মবিশ্বাসের অভাব জন্ম নিয়েছে। এ আমার ইতিবাচক শক্তিটাকে পঙ্গু করে দিয়েছে।

ব্যাপারটা বোঝার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমি দেখলাম, আমার

আগের শক্তি যেন ফিরে এসেছে। বুঝতে পারলাম, আমার অসুবিধাটা কোথায় ছিল। বুঝতে পারলাম নেতিবাচকতা এমন একটা মায়া বা বিভ্রম, যা জীবনের ক্ষতি ছাড়া আর কিছু করে না। সত্য তো এটাই যে, পৃথিবীর সবকিছুই পাগলের মতো সামনের দিকে ছুটছে। জয় করতে, অর্জন করতে ক্লান্তিহীনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কেন আমি তবে পিছিয়ে যাব? আমি কেন রি-একটিভ হব?

আমি ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। শক্তিটা ফিরে আসার পর দেখলাম, আমি আস্তে আস্তে সজীব হয়ে উঠছি। যেন একটা মিথ্যা স্বপ্ন থেকে জেগে উঠছি। আমার উৎসাহ-উদ্দীপনা যেন আগের চাইতেও বেড়ে গেল। কেননা, আগে যে আত্মবিশ্বাস আমার মধ্যে ছিল তা ছিল সহজাত। কিন্তু এখন যা হল তা সচেতন, বিশ্লেষণদীপ্র, চক্ষুষ্মান।

বছর কয়েক আগে আমার স্ত্রীকে একবার মেরুদণ্ডের ব্যথায় প্রায় নয় মাস বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়েছিল। রীতিমতো শয্যাশায়ী। একজন গৃহিণী, যাঁর ওপর পুরো পরিবারের দায়িত্ব এবং যে দায়িত্বে তিনি অভ্যস্ত, সেই দায়িত্ব থেকে তাঁকে যদি এভাবে বঞ্চিত হয়ে বিছানার মধ্যে এত দীর্ঘদিন শুয়ে থাকতে হয় নিঃসঙ্গ, একা, ভবিষ্যতহীন–এ যে তাঁর জন্য কতখানি হতাশার, তা বলে বোঝানো কঠিন। সে-সময় তিনি কোয়ান্টামের কোর্সে এলেন। আমি খুবই আশ্চর্য হয়ে দেখলাম যে, আস্তে আস্তে তাঁর ব্যথাটা কমে গেল। তিনি আগের মতোই স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন। একদম সুস্থ।

আমার বিশ্বাস–সেই কোর্স থেকে কোনো সম্মোহন বা জাদু নয়, আমারই মতো সুস্থ থাকার জোরালো কোনো যুক্তি বা প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন। তারপর অনেক বছর চলে গেছে। কিন্তু ঐ যে বলেছি– জীবনের বিভিন্ন সময় নানা কারণে মানুষ নিষ্ক্রিয়তায় আক্রান্ত হতে পারে। তারও তা-ই হল। আবার তাঁর সেই একই অসুখ দেখা দিল। কিছুতেই কিছু হয় না। কত রকম ওষুধ। কত রকম চিকিৎসা। কত থেরাপি। কিছুতেই না।

তখন অনেকেই তাঁকে পরামর্শ দিল, তুমি আবার ঐ কোর্সে যাও। আগের মতো হয়ত শক্তি ফিরে পাবে। সত্যি সত্যি আবার কোর্সটা করে আসার পর দেখা গেল, তার আত্মবিশ্বাস আগের চেয়ে জোরালো

হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করছেন যে, তিনি সুস্থ। দেখলাম তিনি আগের চেয়ে অনেকটাই ভালো আছেন। কাজেই আমার ধারণা, কোয়ান্টাম যা করে তা তুকতাক নয়, জাদুটোনা বা সম্মোহন নয়, এ এক বিশেষ ধরনের মানবিক শুশ্রূষা। ইতিবাচকতার পক্ষে শক্তিশালী যুক্তি তুলে ধরে ভেতরের আত্মশক্তিকে অজেয় করে তোলা।

শহীদ আল বোখারী তাঁর বক্তৃতায় বলেন, শতকরা ৭৫ ভাগ রোগের কারণ মানসিক। কথাটা খুবই সত্যি। আমাদের ৭৫ ভাগ রোগ আসে মনের অবসন্নতা বা ধস থেকে। মন যদি ভয় পেয়ে যায়, ভেঙে যায় তবে সামান্য কষ্টকেও হাজারগুণ ভারী মনে হয়। ফলে গুঁড়িয়ে যাওয়া মানুষটির কাছে রোগগুলোকেও মনে হয় হাজারগুণ দুর্বহ। কিন্তু মন যদি থাকে বলিষ্ঠ, সমর্থ, ধারণক্ষম, আত্মপ্রত্যয়ী তবে সেই মানসিক স্বাস্থ্যের শক্তিমত্তা বড় বড় অসুখকেও সামান্য ধাক্কায় উড়িয়ে দিতে পারে। রোগমুক্ত থাকার চেয়ে বড় আনন্দ জীবনে আর নেই।

আমার বিশ্বাস, অসংখ্য মানুষ যাঁরা এখানে আসছেন, অনেক খারাপ অবস্থা নিয়েও আসছেন, এখানে এসে তাদের বিশ্বাস করার শক্তি বলীয়ান হচ্ছে। জেগে ওঠার শক্তিতে তারা হয়ে উঠছেন পরাক্রান্ত। এ কী সোজা ব্যাপার! প্রতিটি মানুষের ভেতরেই তো নিজের আত্মশক্তিকে বিশ্বাস করার ক্ষমতা আছে, শুধু সেই ক্ষমতাটাকে একটু চিনিয়ে দিতে হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি তা-ই করছে। মানুষের জেগে ওঠার জন্য, নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য এই যে সহযোগিতা—আমি একে অভিনন্দন জানাই। আমি মনে করি, আমাদের সারা জাতির একটা বড় ঋণ এই প্রতিষ্ঠানের কাছে রয়েছে।

শত ব্যস্ততার মধ্যেও কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নেওয়ার সুবাদে কোর্সের শেষ দিনের প্রত্যয়ন অনুষ্ঠানে নিরাময়, সাফল্য ও প্রশান্তির স্বতঃস্ফূর্ত মুহূর্তগুলো দেখার সুযোগ আপনার হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে আপনার কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই—মেডিটেশনের গুরুত্বটা আপনি কীভাবে দেখছেন?

● মেডিটেশন একটা অসম্ভব সুন্দর জিনিশ। সেদিন যখন কোর্স শেষ হল, অনেকেই কিছু না কিছু নিজেদের কথা বললেন। আমিও কিছু বলেছি। একটা কথা আমি সেদিন বলেছিলাম। কথাটা হল, যে মানুষ

দৌড়াচ্ছে বা কোনো জরুরি কাজে পড়িমড়ি করে ছুটছে, তার মাথায় চট করে কোনো নতুন আইডিয়া আসতে চায় না। কিন্তু অনেকসময় দেখা যায়, দাঁত মাজতে মাজতে আমাদের মধ্যে নতুন আইডিয়া দেখা দেয়। কেন আসে? কারণ আমরা তখন রিল্যাক্সড। অবকাশের মধ্যে আছি। আমাদের শরীর-মনকে শান্ত নির্ভার আর শিথিল করতে পারলে সেই শান্তিপূর্ণ মুহূর্তে আমরা মনের ক্ষমতাকে সবচেয়ে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করতে পারি। তখন আমাদের সৃজনশীলতা পুরোপুরি জেগে ওঠে।

এ অবস্থায় মনকে যেভাবে যা-কিছু দিয়ে উদ্বুদ্ধ করা যাবে, মন সেভাবেই প্রাণিত হবে। মেডিটেশনের সময় এই কৌশলটি ব্যবহার করা হয়। প্রথমে কথায় কথায় মনকে বাস্তব জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নেওয়া হয়। তারপর প্রকৃতির ভেতর পাখির গান আর ঝর্নার শব্দে পরিপূর্ণ এক মনোরম পরিবেশে নিয়ে গিয়ে মনকে অনির্বচনীয়রকম শান্ত ও আনন্দিত করে তোলা হয়। মন সেই মনোরম অবকাশ ও নির্জনতার মধ্যে তখন নিজের ভেতর যে-কোনো কথা গ্রহণ করার জন্য পুরো তৈরি হয়ে যায়।

তখনই শুরু হয় স্বনির্দেশের সেই আশ্চর্য পর্বটি। সেই শান্ত মনকে নিজের উদ্দেশ্যে বলতে বলা হয় ইতিবাচক কিছু কথা। যেমন : আমি ভালো আছি, সুস্থ আছি, আমার শরীর-মন আনন্দে তৃপ্তিতে ভরে আছে বা আমি এক অজেয় মানুষ, জীবনের দুঃখ-কষ্টকে আমি জয় করবই, জীবনের ওপর বিজয় পতাকা তুলে ধরবই ইত্যাদি।

আমি গতকালও একবার মেডিটেশন করেছি। তখন আমার মনে হচ্ছিল, আমার জীবনীশক্তি যেন বেড়ে গেছে। অনেক সতেজ ও সবল হয়ে উঠেছি। কেন এটা হয়েছে? কারণ আমার মস্তিষ্ক গভীর প্রশান্তির ভেতর সব ক্ষমতাকে একখানে করে ঐ ইতিবাচক কথাগুলো মনেপ্রাণে তখন গ্রহণ করেছে বলে। কথাগুলোর প্রতিটি অনুরণন রক্তের কণায় কণায়, প্রাণকোষে প্রাণকোষে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে আমাকে সপ্রাণ ও বলীয়ান করে তুলেছে। আমি যেন নিজেকে ছাড়িয়ে চলে গেছি।

সাধারণভাবে আমরা কেন আমাদের রোগ-শোক-দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে নিজেদের উত্তরণ ঘটাতে পারি না?

● আগেই বলেছি নানা কারণে আমাদের মন বিধ্বস্ত হয়। হতাশা, ভয়, বিপদের কল্পনা, জীবনের দুর্দৈব আমাদের নিষ্ক্রিয় করে। তখন নিজে নিজে তা থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন হয়। আসব কী করে? যে বুদ্ধি বা চিন্তা দিয়ে বেরিয়ে আসব, সেই চিন্তাই তো তখন রোগগ্রস্ত। সে কী করে আমাকে সাহস শক্তি বা উৎসাহ দেবে? কী করে আমাকে সে তখন আশা জাগিয়ে বলবে, ওঠো, চলো, ঝাঁপ দাও, জয় কর। ইচ্ছা থাকলেও তাই আমরা পেরে উঠি না। তখন কেউ পাশ থেকে একটু সাহায্য করলে, হাত দিয়ে একটু ধাক্কা দিলে আমাদের মধ্যে উঠে দাঁড়ানোর শক্তিটা আবার দেখা দেয়। আমরা চলতে শুরু করি। ব্যাটারি ডাউন হওয়া গাড়িকে সবাই মিলে একটা জোর ধাক্কা লাগালে গাড়িটা যেমন চলতে শুরু করে, ব্যাপারটা অনেকটা তেমনি।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সবচেয়ে বড় কাজ এটিই। যে মানুষ ভেঙে যাচ্ছে, পড়ে গেছে, দাঁড়াতে পারছে না; এই যে পারছে না, সেই আতঙ্কে আরও গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, সেই মানুষটাকে সামান্য সাহায্য দিয়ে নেতিবাচকতার কালো বৃত্ত থেকে বের করে আনা। এই শক্তিটুকু জাগলেই দেখা যাচ্ছে তার আর কাউকে লাগছে না। সে নিজেই পারছে। এভাবে অসংখ্য মানুষ আত্মশক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে এই যে উঠে দাঁড়াচ্ছে, নিজের নিষ্ক্রিয়তাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে, এটিকে আমার কাছে একটি বড় ঘটনা বলে মনে হয়।

আপনার মতো আমরাও বিশ্বাস করি যে, তরুণ প্রজন্মকে যদি যথার্থ অর্থে সম্ভাবনাময় জনশক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়, তাহলেই তারা জাতির নিয়তি পরিবর্তনে বড় ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে। এজন্য প্রয়োজন তাদের মস্তিষ্ককে বেশি বেশি ব্যবহার করানো, তাদের ভেতরকার মনুষ্যত্ববোধের উন্মেষ ঘটানো, শারীরিক সক্রিয়তা ও সহিষ্ণুতা বাড়ানো এবং তাদের শুভ উদ্যোগে সঙ্ঘবদ্ধ করা। এই চারটি উদ্দেশ্য সামনে রেখে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কাজ করছে। এটিকে আপনি কীভাবে দেখেন?

● শারীরিকভাবে উপযুক্ত হওয়া এ ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে বাঙালির। আমার একটা বই আছে—*সংগঠন ও বাঙালি*। তার মধ্যে আমি বলার চেষ্টা করেছি, বাঙালিদের ব্যর্থতার সবচেয়ে বড়

কারণ হচ্ছে শারীরিক উপযুক্ততার অভাব। আমাদের একশ জন মানুষের মধ্যে ৯০ জন মানুষের ফিজিক্যাল ফিটনেস নেই। একটা দুরারোগ্য স্বাস্থ্যহীনতা আমাদের অস্থিমজ্জায় জেঁকে বসে আছে। একটা তলহীন গভীর অক্ষমতা ও নির্জীবতা আমাদের সমস্ত চিন্তাচেতনা ও শক্তির ভিত্তিকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে। আমরা তাই চাইলেও আত্মশক্তিতে জেগে উঠতে পারি না। সেজন্য চাই সচেতনতা।

আত্মশক্তিকে জাগাতে না পারলে মানুষ নিজের অক্ষমতাগুলো দেখতে পায় না। দেখতে পায় না বলে তার আরোগ্যও চায় না। সে ব্যাপারে সংকোচ বা বোধও যেন কিছুটা কমে যায়। ওই দুর্দশার বৃত্তের মধ্যেই সে আরও জড়িয়ে পড়ে। সেজন্য জাগাতে হবে সবাইকে। জাগরণের ডাক দিতে হবে। হৃদয় একবার জাগতে শুরু করলেই বাকি দুর্বলতাগুলোকে মানুষ অনায়াসে উৎরে যায়। এই প্রতিষ্ঠান সেই জাগরণী পতাকা বহন করছে।

সৎসঙ্ঘে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়াটাকে আপনি কতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন, বিশেষ করে বর্তমান সমাজে একজন তরুণের সামনে যখন পথ হারিয়ে ফেলার জন্য প্রলোভনের অভাব নেই?

● একজন দক্ষিণ ভারতীয় হিন্দু দার্শনিক ছিলেন, নাম শঙ্করাচার্য। তাঁর একটা কবিতায় তিনি লিখেছিলেন, 'যেভাবে পার এই ক্ষণজীবনে সজ্জনের সঙ্ঘ গড়ে তোলো।' আমিও মনে করি, একা মানুষ একটা শুভ কাজের সূচনা ঘটাতে পারে কিন্তু সজ্জনের সঙ্ঘবদ্ধতা ও সৌহার্দ্য দিয়ে তাকে বলীয়ান করতে না পারলে ওটা একসময় হারিয়ে যায়। যারা এখানে আসছেন সবাই প্রথমেই হয়ত তেমন সক্রিয় হন না। কিন্তু এখানে এসে আত্মশক্তির উজ্জীবনের মধ্য দিয়ে তারা এই যে একটা উচ্চতর জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ, সুস্থ ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছেন, নিজেদের নিয়তিকে অতিক্রম করার দুঃসাহস অনুভব করছেন, এই ব্যাপারটাকে আমি অভিনন্দন জানাই।

কিন্তু এ উজ্জীবন কি এতই সহজ? বৌদ্ধ ধর্মে বলা হয়, *বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি*। অর্থাৎ শুধু ভালো হলেই হবে না। শুধু বুদ্ধ আর ধম্ম হলেই হবে না। গড়ে তুলতে হবে

ভালো মানুষদের সঙ্ঘ। সঙ্ঘ না হলে কোনোকিছুই পৃথিবীতে দীর্ঘস্থায়ী বা মজবুত হয় না। এই যে একটা সঙ্ঘ গড়ে উঠছে, এটাকেই আমার কাছে ভালো লাগছে। এ হল অসংখ্য উপকৃত ও কৃতজ্ঞ মানুষের সঙ্ঘ। এ ধরনের সঙ্ঘ আমাদের দেশে যত বাড়বে দেশ তত এগোবে।

আমরা 'আলোকিত মানুষ' হওয়ার কথা বলি। কিন্তু জানি, আলোকিত হওয়া কত কঠিন। নিজের জীবনের আগুনকে পরিশ্রুত করে তৈরি হয় এই অপরূপ আলোকের শিখা। পুরোপুরি আলোকিত কেউ হতে পারে না। এই আলোর দিকে অগ্রসর হওয়াটাই হচ্ছে আলোকিত হওয়া। তো, সেদিকে আমাদের যাত্রা শুরু হোক। আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ হোক। আমরা যেন মানুষ হিসেবে সুন্দর হই, প্রস্ফুটিত হই। পৃথিবী তো এই প্রত্যাশাতেই আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। যদি আমরা তা হতে না পারি, তাহলে তো সবই মিথ্যা।

বান্দরবান লামার কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের প্যারেড নৈপুণ্য ও পারদর্শিতার একটি ভিডিও আপনি দেখেছেন। আপনি জানেন এদের জীবনের রূপান্তরের কাহিনী। একসময় যারা শিক্ষা ও জীবনের ন্যূনতম সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল, তারাই এখন রাজধানীতে এসে এখানকার প্রথমসারির স্কুলগুলোর সাথে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও খেলাধুলায় পুরস্কার অর্জন করছে। সবচেয়ে দুস্থ জনপদ থেকেও যে সাফল্য ও মানবিকতার উত্থান ঘটতে পারে, এই চিরন্তন বিশ্বাসটার এক ধরনের বাস্তবায়ন করার সুযোগ পাচ্ছি আমরা কোয়ান্টামের সার্বিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে। একে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

● এটি খুবই অসাধারণ ঘটনা। ভিডিওতে ছাত্রদের মধ্যে যে অবিশ্বাস্য যোগ্যতার স্ফূরণ দেখলাম, এককথায় সেটা খুবই বিস্ময়ের। প্যারেড দেখতে দেখতে একেক সময় মনে হচ্ছিল, এরা যেন পৃথিবীর অনেক উন্নত সেনাবাহিনীর সমকক্ষ। এই ধরনের কর্মকাণ্ড সারাদেশের সবখানে নানাভাবে গড়ে উঠুক, এই প্রতিষ্ঠান হোক তার পথ প্রদর্শক। এই ছেলেমেয়েরা দেশের দরিদ্রতম মানুষদের সন্তান। আধুনিক জগতের সবরকম সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত। আন্তরিক চেষ্টার দ্বারা কী ধরনের সাফল্য পাওয়া যায়, এ তার প্রমাণ। তাই এখন এর বিস্তার চাই। বিকাশ

চাই। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন অতন্দ্রভাবে সেটা করছে। এ এখন ছড়িয়ে পড়ুক সারাদেশে, সবখানে। গোটা বাংলাদেশ এর সহযাত্রী হোক।

আপনার পাঁচ দশকেরও দীর্ঘ কর্মজীবনে আপনি শিক্ষকতা করেছেন, সাহিত্য আন্দোলন করেছেন, লিখেছেন, টিভি উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও সক্রিয় ছিলেন। সেইসাথে পরিবেশ আন্দোলন, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও পরিচালনা করা এবং এখনও করে যাচ্ছেন নানা ধরনের কাজ। এই অক্লান্ত কাজের পেছনে আপনার প্রেরণাটা কী?

- আনন্দ। প্রতিটি কাজের প্রাণকোষের মধ্যে লুকিয়ে থাকে মধুর মতো কোটি কোটি আনন্দের সোনালি প্রাণকোষ। তাই আনন্দ, কাজের উদ্দীপনা আর মত্ততার মধ্যে বাঁচতে পারলে অবসাদ, ক্লান্তি, ক্লেদ ধুয়েমুছে একটা ঝকঝকে মানুষ হয়ে ওঠা যায়। বিশেষ করে কাজটা যদি হয় সৃজনশীল। কাজের ভেতর অসম্ভব আনন্দ পেয়েছি জীবনে। রবীন্দ্রনাথ একটা গানের মধ্যে লিখেছেন–

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ।

সেই আনন্দ। এখন জীবন থাকল কী গেল, এ নিয়ে আর দুঃখ নেই। আরও যদি কিছুদিন বেঁচে থাকি, সেই দিনগুলোও যেন এমন আনন্দমত্ত হয়–এটাই চাওয়া।

আপনি জানেন, আমাদের ২০২৫ সালের মনছবি–একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। আমরা কোর্সে শেষ যে মেডিটেশনটি করেছি, আপনার হয়ত মনে আছে গুরুজী একটা স্বপ্নের কথা বলেছেন–আমাদের দেশকে নিয়ে কী করতে চাই, দেশকে কোথায় দেখতে চাই আমরা। আমরা বিশ্বাস করি, যা আমি চাই সেটাকে যদি নির্দিষ্ট করতে পারি এবং সেইসাথে বিশ্বাস করতে পারি সেটি হবেই, তাহলে আমরা তা বাস্তবায়ন করতে পারব। এ ব্যাপারে আপনার দৃষ্টিভঙ্গিটা কেমন? আপনি একে কীভাবে দেখেন?

- আমার একটা জর্নাল বইয়ে আমি লিখেছি, মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড়। মানুষ যা ভাবতে পারে তা-ই সে হয়ে যায়। তাই আমাদের

স্বপ্ন দেখতে হয়। অবাস্তব হলেও দেখতে হয়। কারণ স্বপ্ন দেখতে থাকলেই স্বপ্ন সত্যি হয়ে যায়। আলেকজান্ডার যদি না ভাবতেন তিনি এশিয়ার সম্রাট হবেন, তাহলে তিনি কি তা হতেন?

আমাদের রাষ্ট্র আজ নিঃশব্দে গড়ে উঠছে। একাত্তর সালে আমরা রাষ্ট্র ততটা পাই নি, যতটা পেয়েছি একটা পতাকা। আজ সেই পতাকাকে ঘিরে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রকাঠামো দানা বাঁধছে, ঠিক যেমন চিকন সুতোকে ঘিরে তালমিছরি। এটা ঠিক যে, আমাদের সেই রাষ্ট্রকাঠামোটা এখনও খুবই দুর্বল। এই যে দেশজুড়ে লুটপাট, দস্যুতা, নৈরাজ্য–এসব কেন ঘটছে? ঘটছে আমাদের সবার দুর্বলতার কারণে। আমাদের ভেতরকার লোভ, পাপ আর অন্ধকার এ ব্যাপারে আমাদের প্রতিপক্ষ। দুর্বৃত্ত ও দস্যুরা ক্রমাগতভাবে এ রাষ্ট্রের আইন ও কাঠামোকে তছনছ করে দিচ্ছে। কারণ নিয়মনীতিকে নিষ্ক্রিয় করতে পারলে তারা বেপরোয়াভাবে লুণ্ঠন চালিয়ে বিত্তসম্পদ গড়ে তুলতে পারবে।

তবু বহু মানুষের ক্ষান্তিহীন প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে রাষ্ট্রকাঠামো সংহত হচ্ছে। বিচারবিভাগ গুটি গুটি পায়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। রাজনীতির নৈরাজ্য ও দস্যুতার কারণে রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলো এখনও ঠিকমতো কার্যকর না হলেও রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গনে নানা ধরনের আইন তৈরি হওয়ায় এবং সেগুলোর বেশ কিছু কার্যকর হতে শুরু করায় রাষ্ট্রকাঠামো নিঃশব্দে দানা বাঁধছে। এর মধ্য দিয়ে আমাদের দ্বিতীয় প্রজন্ম উঠে আসছে। আর তার সঙ্গে উঠে আসছে আমাদের আগামীর আইনের রক্ষকেরা। আগের প্রজন্মের চেয়ে এদের নেতৃত্ব-অংশের মূল্যবোধ উন্নত। ২০৩০ সালের দিকে আমাদের রাষ্ট্র মোটামুটি যাত্রা শুরুর পর্যায়ে উঠে দাঁড়াবে বলে আমার বিশ্বাস।

আপনাকে ধন্যবাদ।

- তোমাকেও ধন্যবাদ।

স্বপ্ন ও সঙ্ঘ

স্যার, একটা গল্প দিয়ে শুরু করি। পোলিশ রাজনীতিক পেদেরেস্কি-র (ইগন্যাসি জ্যান পেদেরেস্কি) কথা আপনি জানেন। গত শতকের গোড়ায় যিনি পোল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং কিছু সময়ের জন্য প্রধানমন্ত্রীও হয়েছিলেন। তিনি তাঁর সময়ের একজন খ্যাতনামা পিয়ানো বাদক এবং সুরকার। একদিন এক অনুষ্ঠানে তিনি দুর্দান্ত পিয়ানো বাজালেন। অনুষ্ঠান শেষে শ্রোতাদের মধ্য থেকে একজন ভক্ত এসে ভীষণ উচ্ছ্বাসে তাঁকে বললেন, এত চমৎকার আপনি বাজালেন, মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনলাম! এরকম বাজাতে পারলে আমি আমার জীবনটাই দিয়ে দিতাম। শুনে মৃদু হেসে পেদেরেস্কি বললেন, 'আমিও কিন্তু দিয়েছি'। স্যার, আপনার কথা, লেখা আর জীবনদর্শনেও আমরা প্রায়শই এ জিনিশটি পাই। আপনি প্রায়ই বলেন, কিছু পেতে হলে তার জন্য দিতে হয়। জীবনকে উৎসর্গ করতে হয়।

● বড় কিছু পেতে হলে আমাদের যে কিছু দিতে হবে, এ তো নতুন কথা নয়। কিন্তু তা নিগ্রহ বা কষ্টের মধ্য দিয়ে দিলে হবে না, দিতে হবে জীবনের সুপ্রচুর উদ্‌যাপনের ভেতর দিয়ে। সব কাজ আমাদের কাছে সমান আনন্দ নিয়ে আসে না। অথচ আনন্দ না থাকলে সাধনা শুকিয়ে ওঠে। অবন ঠাকুরের খুব সুন্দর একটা কথা আছে। কথাটা হল : 'মানুষ কি ভেরেণ্ডা গাছ খেতে পারে? পারে না; কিন্তু আখ গাছ খেতে পারে। কেন? খেতে পারে এর ভেতরকার মাধুর্যের জন্য। এর ভেতর মিষ্টি রস

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ডা. আতাউর রহমান, মে ২০১৫

আছে বলে।' জীবনও তা-ই। এর পরিপক্ক ফলটি পেতে হলে এর ভেতরকার মাধুর্যটি আস্বাদন করতে হয়। না হলে এ হয়ে যায় খরখরে কাঠের মতো।

জীবন উৎসর্গ করা মানে ভয়ংকর চেহারা করে দুরূহ শপথে জীবনকে শ্বাসরুদ্ধ করা নয়। উৎসর্গের আসল মানে আনন্দ। উৎসর্গ মানে উদ্‌যাপন। সর্বোচ্চ আনন্দ আর উদ্দীপনার আলোয় বিচ্ছুরিত হওয়া। যার কাছে বেঁচে থাকা মানে জীবনকে নিগ্রহ নিষ্পিষ্ট করা, সে কিন্তু আসলে জীবন উৎসর্গ করে না। কর্মদানব আর কর্মবীর এককথা নয়। কর্মদানব নিজেকে জবাই করে জীবনকে পায়, আর কর্মবীর পায় জীবনকে বিকশিত করে। ওটাই প্রকৃত উৎসর্গ। এ উৎসর্গ শ্রেয়তর জীবনের জন্য। উচ্চতর লক্ষ্যের জন্য।

সুতরাং পেদেরেস্কি যখন বলছেন তিনি জীবন উৎসর্গ করেছেন, তিনি আসলে অসংখ্য অসামান্য সংগীতময় মুহূর্ত উদ্‌যাপনের কথাই বলেছেন। তার মানে আবার এ-ও নয় যে, সাধনা একটা হাওয়াই মিঠাই যাকে মাদক বা সিগারেটের মতো সেবন করা চলে। এখানে দুঃখ কষ্ট পরিশ্রম সবই আছে। বাইরে থেকে দেখলে এ এক নিষ্ঠুর নিবেদন। কিন্তু ভেতর থেকে দেখলে–যেমনটা রবীন্দ্রনাথ দেখতেন–একটা পরিপূর্ণ জীবনাস্বাদন। তিনি স্বপ্ন দেখেছেন এমন সাধনার–

সে সাধনায় মিশিয়া যায় বকুলগন্ধ,
সে সাধনায় মিলিয়া যায় কবির ছন্দ ––

যে সাধনায় বকুল ফুলের গন্ধের সজীব মাধুরী নেই তা সাধনা নয়। ও এক ধরনের আত্মনিগ্রহ। এক ধরনের মানুষ আছে, যারা জীবনের সম্ভাবনার পাপড়িগুলোকে কুৎসিত আঙুলে টিপে টিপে কেবলই মাধুরী বের করতে চায়। কিন্তু তা সফল হয় না। রসের বদলে বের করে কষ।

তাহলে কাজকে উপভোগ ও উদ্‌যাপন করতে হলে কী করতে হবে আমাদের?

- উত্তর একটাই : নিজের হৃদয়কে অনুসরণ কর। সে কী খোঁজে, কী চায়–দেখতে চেষ্টা কর। তোমার আত্মার ক্রন্দন, রক্তের আকুতি কোন পথের অভিসারী নিশ্চিতভাবে জেনে নাও। মনে রেখো, তোমার

ইচ্ছা কিন্তু তোমার ক্রীতদাস নয়, তারও একটা সার্বভৌম সত্তা আছে। তারও আছে আলাদা জগৎ, আলাদা আকাঙ্ক্ষা। তার সার্বভৌমত্বকে সম্মান কর। সে যেদিকে যেতে চায় তাকে সেদিকে যেতে দাও। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় আমরা আমাদের লোভের যাঁতাকলের নিচে হৃদয়ের ওই চাওয়াগুলোকে নিষ্পেষিত করি। ওর স্বাধীন ইচ্ছার দিকে একেবারেই তাকিয়ে দেখি না। তাকে গুঁড়িয়ে-চুরিয়ে আমাদের ইচ্ছার গণ্ডির ছকে তৈরি করি। তখন ও আর উচ্চতর সাধনা থাকে না।

টাকার জোরে কি আনন্দ কেনা যায়? তখন ওটা হয়ে যায় একটা নিখাদ নিগ্রহের নাম। তখন রগ ফুলে ওঠে, পেশি কদাকার হয়, চেহারাটা আস্তে আস্তে করাল দৈত্যের মতো হয়ে দাঁড়ায়। মুক্তির জন্য চেষ্টা করেও একটা অভিশপ্ত জীবনের মধ্যে আমাদের শেষ হতে হয়।

কিন্তু কিছু দরকার তো জীবনে চলার পথে দেখা দেবেই। যেমন আপনিই তো বলেন, চারপাশের বেদনায় শুভবোধসম্পন্ন মানুষের হৃদয়টা জাগে, তার হৃদয় তৈরি হয় সেই বেদনা বা দুঃখ দূর করার কাজে। এটাও তো একটা চাওয়াই–দরকারেরই চাওয়া–এই দুঃখের প্রেরণায় যদি আমি একটা নির্দিষ্ট কাজের দিকে যাই, তাকে কি ভুল বলা যাবে? এ ব্যাপারটাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

● বেদনায় জেগে ওঠাটাই আসল ঘটনা। এরপর তার সামনে শুধুই আনন্দময় পৃথিবী। কিন্তু যার এটা হয় না অর্থাৎ হৃদয় জাগে না, শুধু কসরত করে দিন যায়, তার জন্য জগৎ দুঃসহ এক নির্যাতনশালা। তাই জাগতে হবে। জেগে ওঠা মানে অসম্ভবকে স্পর্শ করা। রবীন্দ্রনাথ *নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ* কবিতার শেষদিকে লিখেছেন, *দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান*–। এই ‘জাগিয়া উঠিল প্রাণ’ মানেই গান শুরু হয়ে গেল। সে গান মহাসাগরের জন্য, বিশ্ব চরাচরের জন্য। চিরসংগীতময় একটা জগতে তখন আমরা বাঁচি। আনন্দ পেয়ে আর আনন্দ দিয়ে তখন জীবনের উদ্‌যাপন।

আচ্ছা, কাজের মধ্য দিয়েই তো সাফল্য আসে। এই সাফল্যটা আমাদের জীবনে কেন দরকার?

● এর উত্তরে প্রশ্ন করি, জীবনে ব্যর্থতা কি আকাঙ্ক্ষিত? ব্যর্থতা অনেকসময় প্রেরণা হিশেবে কাজ করে ঠিকই, কিন্তু মোদ্দাকথায়, ব্যর্থতা মানে তো অন্ধকার। ব্যর্থতা মানে তো সমাপ্তি। সুতরাং আমাদের যাত্রা তখন হবে এর বিপরীত দিকে। অর্থাৎ সাফল্যের দিকে। যে সাফল্য আলোর প্রতীক, সম্ভাবনার প্রতীক–সেই সাফল্যের দিকে। তাই আমরা যা চাই তার অন্য নাম আলো, আরও আলো। এটা যদি না হয় তবে জীবন নিষ্পত্র হয়ে যায়।

তবে তোমরা যতই বল, সাফল্যকে একটা পর্যায়ের পর আমি বড় কিছু মনে করি না। কারণ সাফল্য একটা বৈষয়িক জিনিশ, স্থূল জিনিশ। এর লক্ষ্য জাগতিক প্রাপ্তি। আমি বড় মনে করি সার্থকতাকে। আসলে সাফল্য নয়, জীবনে যা দরকার তা হল সার্থকতা। এখন কথা উঠবে, সার্থকতা মানে কী? সার্থকতা মানে সামগ্রিক পূর্ণতা। আমি যা-কিছু নিয়ে জন্মেছি, তার সুসম্পূর্ণ আনন্দচকিত প্রস্ফুটন। তার সর্বোচ্চ স্ফূরণ, উচ্চতম বিকাশ। গীতাঞ্জলিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন–

ঘন শ্রাবণ-মেঘের মতো
রসের ভারে নম্র নত
একটি নমস্কারে, প্রভু,
একটি নমস্কারে
সমস্ত মন পড়িয়া থাক্
তব ভবন-দ্বারে।

তাই সফল সেই মানুষ–যে পৃথিবীর কাছ থেকে নেয় বেশি আর সার্থক সেই মানুষ–যে দেয় বেশি। এই সার্থকতাই শেষপর্যন্ত জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু একটা বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত সাফল্য আমাদের চাই। যেমন, টাকার কথাই ধরা যাক। অনেক বেশি হয়ে গেলে এ আত্মঘাতী জিনিস। কিন্তু কিছু পরিমাণ না হলে তো সবই ভণ্ডুল। সব ক্ষেত্রের জন্যই এ সত্য। সীমালঙ্ঘনকারীকে আল্লাহ ভালোবাসেন না–কথাটা তো আমাদের ধর্মগ্রন্থে বারে বারে বলা হয়েছে।

সাফল্যের মধ্য দিয়ে তো আত্মবিশ্বাসও আসে, যার পথ ধরে আমরা সার্থকতার দিকে যাওয়ার একটা শক্তি পেতে পারি।

● হ্যাঁ, সাফল্যে মানুষের আত্মবিশ্বাস বাড়ে। কিন্তু সেটা ঐ সীমিত সাফল্য—যে সাফল্য জীবনের সপক্ষে। কিন্তু আরও ওপরে উঠে আমাদের ছাড়িয়ে গেলে সে হয়ে পড়ে একটা আত্মধ্বংসী ব্যাপার। তখন তার ওপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ থাকে না। সে তখন হয়ে ওঠে সার্বভৌম। দুই দু-গুণে চার, চার দু-গুণে আট, আট দু-গুণে ষোল, ষোল দু-গুণে বত্রিশ এভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে সে বাড়তে থাকে। এ সাফল্য নির্বিবেক, জান্তব। অন্যদিকে, সীমিত সাফল্যের মতো সুন্দর জিনিস পৃথিবীতে প্রায় নেই। এটুকু আমাদের পেতেই হবে। একেবারে কোনোকিছু না পেলে মানুষ কী করে দেবে? কিন্তু সার্থকতা অন্য ঘটনা। এ পাওয়ার মধ্য দিয়ে আসে না, আসে দেওয়ার মধ্য দিয়ে।

এ দেওয়ার প্রেরণাটা মানুষ কোথা থেকে পায়? এককেজন মানুষ তো নিশ্চয়ই এটা এককে জায়গা থেকে, এককে অনুভূতি থেকে পায়।

● মানুষ নিজে নিজের সবচেয়ে কাছের, তাই নিজেকে সাধারণত চেনে সে সবচেয়ে বেশি। তারপর চেনে বাবা মা ভাই বোন স্বামী স্ত্রী সন্তানদের। অর্থাৎ কাছের মানুষদের। এরা নিজের তুলনায় কিছুটা দূরের, তবু কাছের। নিজের মতো না হলেও এদের দুঃখ-কষ্টও কিন্তু আমাদেরই দুঃখ-কষ্ট। তাই দেখা যায়, নিজের দুঃখ-কষ্টকে কমিয়ে আনার জন্য আমরা যেভাবে চেষ্টা করি, অন্যের দুঃখ-কষ্ট কমিয়ে আনার জন্যও একইভাবে, বরং কখনও এর চাইতেও বেশি চেষ্টা করি। কারো কারো কাছে এই 'অন্যের' ধারণাটা অনেক বেশি ছড়ানো। কারো কাছে এ পাড়া-প্রতিবেশী পর্যন্ত। কারো কাছে নিজের দেশ বা জেলা পর্যন্ত। কারো কাছে গোটা মানবজাতি বা বিশ্বচরাচর পর্যন্ত বিস্তৃত।

অনেকসময় বলা হয় যে, অমুকে অন্যের জন্য এত করল কিন্তু নিজের ছেলেমেয়ে আর পরিবারের জন্য কিছুই করল না। এটা বলার একটাই কারণ, সাধারণভাবে মানুষ নিজের সন্তানকেই শুধু সন্তান বলে মনে করে। আর ঐ মানুষটি চারপাশের সব সন্তানকে নিজের সন্তান মনে করে। তাই কেবল নিজের সন্তানের না, সবার সন্তানের জন্য সে কাজ করছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই গড়পড়তা মানুষ তার এই আচরণটাকে উদ্ভট বলে মনে করে। ধরতে পারে না। তাদের মাথায় আসে না অন্যের

সন্তান আবার কী করে নিজের সন্তান হয়। ওদের জন্য অত করতে হবে কেন? তাদের কাছে সন্তান মাত্র একরকম : জৈবিক। জৈবিকতার বাইরের আত্মিক সন্তানকে তারা চেনে না।

এখন প্রশ্ন, এতে লাভটা কোথায়? লাভ এখানে যে, অন্যের সন্তানকে যখন কেউ নিজের সন্তান বলে ভাবতে পারে, পৃথিবীর সব মানুষকে 'আমি' হিশেবে ভাবতে পারে, তখন তাদের দুঃখ কমানোর জন্য তার মধ্যে একটা প্রাণনা তৈরি হয়। অন্যের জন্য কাজ করে বলে নিজের দুঃখ-কষ্টকে সে ভুলে থাকার সুযোগ পায়। তাছাড়া এর সঙ্গে পায় আরেকটা জিনিশ। অন্যদের সুখী করার আনন্দ। তার কাজের ভেতর দিয়ে প্রতিমুহূর্তে একটু একটু করে মানবজাতির দুঃখ কমছে, এ তো তার একটা আনন্দ। সুতরাং শেষপর্যন্ত সে একটা অপেক্ষাকৃত সুখী জীবনে বাস করছে। এটুকু না পেলে কারো পক্ষে অন্যের দুঃখ বা নিজের দুঃখ কমানো–কোনোটাই সম্ভব না।

একজন মানুষ যে অন্যের সন্তানকে নিজের সন্তান বলে মনে করে বা অন্যের কষ্টকে নিজের কষ্ট বলে ভাবে, এই বোধ কি পুরোটাই একজন মানুষের জন্মগত, নাকি কোনোভাবে তার চিত্তের আলোকায়ন ঘটাতে পারলে কিংবা নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন কোনো সঙ্ঘের সাথে একাত্ম হতে পারলে এটি অর্জন করা যায়? আপনি কীভাবে দেখেন বিষয়টা?

● এর কিছুটা তো জন্মগত অবশ্যই। কিন্তু সবাই কি সব কাজ সমানভাবে পারে? কেউ বেশি পারে, কেউ কম। আশেপাশের মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখলে বেদনাবিদ্ধ হয় না, এমন মানুষ কজন? যদি দেখা যায় কাছাকাছি কোথাও টর্নেডোতে বহু বাড়িঘর উড়ে গেছে, মানুষের মৃতদেহ পড়ে আছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, সবকিছু বিধ্বস্ত লণ্ডভণ্ড, তখন কি মানুষ সহজাত মমতা থেকে উদ্ধারকাজে ছুটে যায় না? ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করে না? সবাই তো করে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় দেশের প্রতিটা মানুষ কি পরস্পরের পাশে এসে দাঁড়ায় নি?

আজ দেশের নৈরাজ্যপূর্ণ পরিবেশে যাদের দুষ্কৃতিকারী দুর্নীতিগ্রস্ত বলছি, তাদের অনেকের মধ্যেও তো একদিন এই মানবিক দিকটা দেখেছি। হয়ত আজ অন্য লোভ, অন্য লিপ্সা তাদের ভিন্ন পথে নিয়ে

গেছে। কিন্তু তাদের মনের তলে ঠিকই ঐ শুভ দিকটি রয়ে গেছে। যদি আজ আমাদের পরিবেশ অনুকূল হয়ে আবার তাদের ডাক দেয়, বলে– ‘জাগো!’, তখন দেখা যাবে তাদের মধ্য থেকে সেই অনন্য মানুষটা আবার উঠে দাঁড়িয়েছে।

মানুষের মধ্যে ভালো জিনিশের অভাব নেই, সবচেয়ে খারাপ মানুষটির মধ্যেও না। কিন্তু বৈরী পরিবেশ সেসব ধ্বংস করে তাদের কখনও কখনও জল্লাদ করে তোলে। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় খুব সুন্দর করে বলেছেন, যে লোকটা সারা বছর মহাজনি ব্যবসা করে মানুষের রক্ত নিংড়ে টাকা রোজগার করেছে, সেই লোকটাই পূজোর সময় তার সবকিছু ঢেলে দিচ্ছে একটা পুতুলের পেছনে।

এই তো মানুষ। এই দ্বৈততার জন্যই মানুষ সুন্দর। একইসঙ্গে সে দেবতা এবং শয়তান; শক্তিমান ও হাস্যকর। কোনটা তাকে প্রভাবিত করবে তার অনেকটাই নির্ভর করে পরিস্থিতি কোন দিকে তাকে ডাক দিচ্ছে তার ওপর। মানুষকে দিয়ে ভালো কিছু করাতে চাইলে ‘ভালো’র কাছ থেকে ওই ডাকটা আসতে হবে। ওটা কানে এলে তবেই না আমাদের উচ্চতর ও শ্রেয়বোধসম্পন্ন মানুষটা জেগে উঠবে। শুভ চেতনার আহ্বান তাই এত গুরুত্বপূর্ণ। ওটুকু পেলেই দেখা যায় মানুষ ভালো কাজ করছে।

এই যে ডাক দেয়ার কথা বা মানুষকে জাগিয়ে দেয়ার কথা বললেন, সঙ্ঘ বা সংগঠন এখানে কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে?

● সঙ্ঘ বা সংগঠন এ ব্যাপারে কিছুটা ভূমিকা রাখতে পারে সত্যি, কিন্তু এর কোনো নির্দিষ্ট ফর্মুলা বা ছক নেই। এর কোনো যান্ত্রিক প্রক্রিয়াও নেই। এ একেবারেই হৃদয়ের ডাক, যা হয়ত নিজের মধ্যেই তৈরি হয়ে আছে কিন্তু এখনও ততটা জোরালো হয়ে ওঠে নি বলে নিজের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না। কিন্তু ডাক এলে কিংবা জাতির প্রতিটা প্রাণের ভেতর ডাকটা স্পন্দিত হতে শুরু করলে দেখা যাবে, ভেতরে চাপা পড়া স্বার্থলোভ-আবিল মানুষটা আবার নতুন জীবনস্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে এবং মানুষের দুঃখের পাশে অবস্থান নিয়েছে। আজ আমাদের শুধু দরকার অতি জরুরি সেই আহ্বানটি।

আমার অনেকসময় মনে হয়, আমাদের চারপাশের যেসব মানুষ একদিন স্বাধীনতার জন্য এত ত্যাগ স্বীকার করেছিল, তাদের অনেকেই কী করে লোভ আর স্বার্থান্ধতার শিকার হয়ে একসময় এমন নিচে নেমে যেতে পেরেছে? কিন্তু আমি জানি আজও যদি আবার সেদিনের মতো কোনো জাতীয় প্রয়োজন সামনে এসে দাঁড়ায়, তাহলে দেখব এই মানুষদের মধ্য থেকেই আবার নতুন মানুষ জেগে উঠেছে। মানুষের মধ্যে আছে নিজের কাছেও অজ্ঞাত আরেক বিস্ময়কর মানুষ। এর জন্যই মানুষের পৃথিবী আজও মরে নি। মানুষই একমাত্র প্রাণী, যে তার পতনের বিরুদ্ধে জয়ী হওয়ার শক্তি রাখে।

আগেই বলেছি, যখন প্রয়োজনে বা হৃদয়ের ডাকে সাড়া দিয়ে ঐ মানুষটা জেগে ওঠে, তখন কোনো সাধারণ মানুষই আর সাধারণ থাকে না। তার মধ্যে তখন অনেক বেশি শক্তি চলে আসে। মুক্তিযুদ্ধের সময় এটাই ঘটেছিল। এ না হলে হাজার ডাকাডাকিতেও তাকে মানুষ উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। সঙ্ঘ এখানে একটা বড় ভূমিকা রাখে।

অর্থাৎ সঙ্ঘ এক্ষেত্রে আয়োজনটা করে দিতে পারে ...।

● মানুষ যখন জাগে তখন সঙ্ঘ তাকে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু প্রথম আহ্বানটা করতে হয় একজন ব্যক্তিকেই– যে স্বপ্ন দেখতে পারে, দেখাতে পারে। হ্যামিলনের সেই বাঁশিওয়ালার মতো অলৌকিক বাঁশি যার হাতে আছে, সে-ই শুধু এটা পারে।

আর সংগঠন হচ্ছে একটা কর্মপদ্ধতি, যার মধ্যে একটি সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়া ও কাঠামো আছে, যার ভেতর দিয়ে এ জাগরণকে স্থায়ী ও বাস্তব রূপ দেওয়া সম্ভব হয়। ফলে স্বপ্নটা অনেক বেশি শক্তি ও গতি নিয়ে এগিয়ে যায়। এই কাঠামো আর কর্মপদ্ধতিটা যদি সে না পায়, তাহলে ব্যক্তিমানুষের সমস্ত আহ্বান ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। স্বাধীনতার পর আমাদের দেশ মূলত এই কাঠামো ও সংগঠনের অভাবে এবং নেতৃত্বের অভাবেই ধীরে ধীরে একটা নৈরাজ্যপূর্ণ অবস্থার দিকে চলে গেছে।

কিছুদিন আগে কথাপ্রসঙ্গে আপনি বলছিলেন যে, উন্নত প্রজাতির হাঁসমুরগি, গবাদিপশুর পেছনে সারাজীবন লেগে থাকতে হয়, কিন্তু মানুষের জন্য দরকার

এক মুহূর্তের ছোট্ট একটা প্রজ্বলন। একবার জ্বলে উঠতে পারলেই হল, তারপর সে নিজেই নিজের বিকাশের দিকে এগোতে পারে। এই স্ফুরণটা কি কোনোভাবে সঙ্ঘের মধ্যে দিয়ে আসতে পারে?

● অনেকসময় দেখা যায়, কোনো বিশেষ আকুতিতে একজন মানুষের হৃদয় জেগে উঠছে, কিন্তু সে জ্বলে ওঠার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। কখনও এমন মানুষের সংখ্যা একজন নয়, লক্ষ লক্ষ এমনকি কোটি কোটিও হতে পারে। তখন দরকার কেবল একটা দেশলাইয়ের কাঠি, যা তাদের হৃদয়কে জ্বালিয়ে দেবে।

দিনে পাঁচ বার নামাজ পড়তে হয়, এ আমরা সবাই জানি। কখন কোন নামাজ পড়তে হয় তা-ও জানি। কিন্তু তবুও মসজিদের মিনার-শীর্ষ থেকে একজনকে উচ্চকণ্ঠে ডাক দিতে হয়। মনে করিয়ে দিতে হয়–ওঠো, জাগো, নিদ্রার চাইতে প্রার্থনা উত্তম। সেই বেলালকে তো চাই, যে জাগানোর ডাক দেবে। ওটা সংগঠনের কাজ নয়, একজন অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ মানুষই কেবল এ পারে। সংগঠন হলো এর পরবর্তী পর্যায়। ওই জেগে ওঠা মানুষদের সুশৃঙ্খল, সংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ করে ওপরের দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া।

যারা ওই ডাকটা দেন, অনেকসময় তারা নিজেরাই সংগঠন গড়ে দিয়ে যান। আবার কখনও দেখা যায়, তারা ডাক দিয়ে হারিয়ে গেছেন, সংগঠন সেই আহ্বান অনুসরণ করে গড়ে উঠছে। ইসলাম ধর্মে আমরা দেখি, যিনি ডাক দিয়েছেন তিনিই সঙ্ঘ গড়ে তুলেছেন, বৌদ্ধ ধর্মেও অনেকটা তা-ই। কিন্তু খ্রিষ্টান ধর্মে আবার তা হয় নি, যিনি ডাক দিয়েছেন তাঁকে অনেক আগেই চলে যেতে হয়েছে। সঙ্ঘ গড়ে উঠেছে পরে। অর্থাৎ আগে একজন মানুষ এবং তাঁর আহ্বান, পরে সঙ্ঘ। সঙ্ঘের জন্য চাই প্রেরণা। ঐ প্রেরণা থেকে যে জাগরণটা ঘটল, তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য জন্ম সংগঠনের।

আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে। মানুষের তৈরি কোনোকিছুই মানুষের চেয়ে বড় নয়। এত বড় ডিজিটাল পৃথিবী মানুষ তৈরি করেছে অথচ এর স্রষ্টা মানুষ কিন্তু এনালগ। মানুষের ভুল-ত্রুটি আছে, বিচ্যুতি আছে। নৈরাশ্য, আর্তনাদ আছে। কিন্তু তার তৈরি জিনিশে বিচ্যুতি নেই, ওটা যান্ত্রিক সাফল্যের নির্ভুল শীর্ষে চলে যেতে পারে।

অমর কথাশিল্পী ম্যাক্সিম গোর্কির লেখা একটা গল্প আছে–*চেলকাশ*। গল্পের নায়ক চেলকাশ একজন চোর। সে বন্দরে চুরি করে বেড়ায়। একদিন সে দেখল বন্দরে একটা বিশাল জাহাজ এসে ভিড়েছে। তার পাশেই ঘাটের ওপর কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। অতিকায় জাহাজটার পাশে ছোট্ট মানুষগুলোকে খুবই করুণ আর হাস্যকর লাগছে। মনে হচ্ছে নিজের সৃষ্টির পাশে মানুষ নিজেই যেন হাস্যকর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এটা হতেই পারে। মানুষ নিজে বাঁচে না কিন্তু রবীন্দ্রনাথের *সোনার তরী*-র মতো মৃত্যুহীন সোনার ধান পৃথিবীতে রেখে যেতে পারে। আজকের ডিজিটাল পৃথিবী মানুষের শক্তিকে অন্তত এক হাজার গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এ-তো মানুষেরই তৈরি। সেজন্য নিজের সৃষ্ট ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন বা দানবের চেয়ে সে বড়। নিজের অসহায় অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে সে ঐ বৈরী ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনকে ধ্বংস করে আরও শক্তিশালী ও অনুকূল ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনকেও তৈরি করতে চায়।

আগেই বলেছি, মানুষই জীবজগতের একমাত্র প্রাণী যে নিজের পতনকে প্রতিরোধ করতে সমর্থ। ভুল হচ্ছে সেই জিনিশ, যা দিয়ে মানুষ নিজেকে অতিক্রম করে। পৃথিবীতে যার মধ্যে ভুলের পরিমাণ যত বেশি, সে-ই তত বড়। এই ভুল আছে বলেই মানুষ একদিকে যেমন অপ্রতিভ তেমনি তার মধ্যে আছে ছাড়িয়ে যাওয়ার বন্যতা। একটা যন্ত্রের কি সে ক্ষমতা আছে?

আমরা অনেকেই টমাস আলভা এডিসনের অজস্র আবিষ্কারের কথা জানি। তাঁকে জিগ্যেস করা হয়েছিল যে, এত সব উদ্ভাবন করতে গিয়ে জীবনে কতগুলো ভুল করেছেন আপনি? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, দশ হাজার। এরপর জিগ্যেস করা হয়েছিল, এত ভুল থেকে তাঁর কী লাভ হয়েছে? তিনি বলেছিলেন, দশ হাজার ভুল করার ফলে দশ হাজার নতুন বুদ্ধি আমার মাথায় এসেছে।

সুতরাং ভুল করা, ব্যর্থ হওয়া, হেরে যাওয়া–এসব কোনো খারাপ জিনিশ নয়। বরং এসব আছে বলেই মানুষ যন্ত্রের ওপরে। ভুল আর পতনের দুর্ভাগ্য আছে বলেই না সে পতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চায়, ভুলকে জয় করতে চায়। আগেই বলেছি যন্ত্রের এ শক্তি নেই। বরং যন্ত্র যদি ভুল করে তাহলেই সর্বৈব সর্বনাশ। কারণ নিজের ধ্বংস ঠেকাতে সে

অক্ষম। আর কোনো মানুষের মধ্যে যদি এ না থাকে তাহলে সে ব্যর্থ। কারো ভুল নেই মানে তার উত্তরণ নেই। নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রেরণা নেই।

তোমার প্রশ্নের উত্তরেই ফিরে আসি। সেটা হল, মানুষই বড়। তা এজন্য যে, যে সংগঠন মানুষের চাইতেও বড়, তারও জনক কিন্তু ব্যক্তি।

স্যার, আপনার তো চার দশকেরও বেশি সংগঠন-অভিজ্ঞতা, এখনও সংগঠন নিয়েই আপনার দিনের সিংহভাগ কাজ আর চিন্তা। একটা সংগঠন দাঁড়াতে বা সঙ্ঘের ভিত্তি সংহত ও মজবুত হতে কত সময় দরকার? এ নিয়ে আপনি নিজে কী ভাবেন?

● এটা সার্বিকভাবে বলা যাবে না। তবে এ ব্যাপারে একটা আধখাঁচড়া কথা শুধু বলা যায়। সেটা হল, যে সংগঠন থেকে অনুপ্রাণিত মানুষেরা থেকে থেকে নতুন উদ্যমে জন্ম নেবে, শেষপর্যন্ত সেই সংগঠনই টিকে থাকবে—তা তারা সে সংগঠনের মূল ধারাকে প্রতিবাদই করুক আর সমর্থনই করুক। অর্থাৎ যে সংগঠনের মূল স্বপ্ন সময়ের পরীক্ষায় পাস হবে, সে সংগঠনই টিকে থাকবে। সঙ্ঘের এই জাগ্রত সন্তানেরাই সংগঠনের দীর্ঘবাহিতার স্তম্ভ। যদি কোনো সঙ্ঘে এই মানুষ না জন্মায়, তবে সে সঙ্ঘ একসময় ধসে যাবে। আর যদি উল্টোটা হয় তবে ওই সংগঠন দিনের পর দিন আরও বিস্তৃত, শক্তিশালী, বলীয়ান ও সংহত হবে। নতুন নতুন স্বপ্ন জাগানোর ক্ষমতা যে সংগঠনে যত বেশি সেটি তত দীর্ঘস্থায়ী।

এজন্যই প্রত্যেকটা বড় ধর্মে দেখা যায়, মূলে যিনি ধর্মটা প্রচার করেছেন, তাঁর সঙ্গেই ধর্মটা থেমে যায় নি। তাঁর পরেও অনেক নতুন ব্যাখ্যা, চিন্তা, নতুন তত্ত্ব নিয়ে পরবর্তী যুগে অনেক প্রতিভাধর মানুষ এসে সে ধর্মকে যুগোপযোগী করে রাখার চেষ্টা করে গেছেন। তাঁরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ধর্মের মূল চেতনার দীর্ঘায়ু নিশ্চিত করেছেন। এর ফলে অনেক কোন্দল হয়েছে, প্রাচীনপন্থী-নতুনপন্থীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত হয়েছে কিন্তু এসব ঘাত-প্রতিঘাতের পরও ওই সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে ধর্মগুলো আরও দীর্ঘসময় ধরে বেঁচে থেকেছে। তবে একটা কথা : ঐ সংগঠন থেকে উঠে আসা এবং জেগে ওঠা মানুষেরা যেদিন সে

সংগঠনের নেতৃত্ব বা দায়িত্ব নেবে সেদিনই মূলত ঐ সংগঠন বা সঙ্ঘ সত্যিকারভাবে স্থায়ী হবে।

আর একটা কথা। সংগঠন মূলত সময়ের প্রয়োজনেই জন্মায়। সে-যুগ বা যুগের প্রয়োজন শেষ হলে সংগঠনের মৃত্যুও তাই অনিবার্য হয়ে ওঠে। মহত্তম প্রতিভা এসেও এ মৃত্যু ঠেকাতে পারে না। হয়ত এমন নীরক্ত পরিস্থিতিতে মহত্তম প্রতিভা আসেও না। ধরা যাক, একজন কবি মারা গেছেন ৩০ বছর বা ৪০ বছর আগে। কিছু মানুষ তাঁর জন্মবার্ষিকী কিংবা মৃত্যুবার্ষিকী পালন করছেন। দেখা গেল সেই সভার শ্রোতারা অধিকাংশই বৃদ্ধ। এই দৃশ্য দেখলে একজন বুদ্ধিমান মানুষ মাত্রই বুঝবে, মানুষের জগতে ওই কবির আয়ু আর খুব বেশিদিন নেই। ঐ বৃদ্ধদের মৃত্যু হওয়ার সাথে সাথেই তিনি শেষ হবেন। সেই কবিই দীর্ঘজীবী–যার জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে তরুণদের ভিড়। তরুণ হৃদয়ের এই সাম্পানে চড়েই তাঁর কবিতা জগৎ-সাগরে দীর্ঘপথ পাড়ি দেয়।

তাই বলা যায়, সেই সংগঠনই সবচেয়ে দীর্ঘায়ু হয়, যার সামনে বেঁচে থাকে একটা বড় স্বপ্ন। স্বপ্ন বহু রকমের। কিছু স্বপ্ন আছে যা অতীতকে ভবিষ্যৎ করে তুলতে ব্যগ্র, কোনো স্বপ্ন বর্তমানের সম্পন্নতার জন্য, কেউ ভবিষ্যতকে বিকশিত করার জন্য। সেই সংগঠনই শ্রেষ্ঠ, যা ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির স্বপ্নটা ঠিকমতো দেখাতে পারে।

আপনি প্রায়ই বলেন–আমাদের জাতির জন্য এ যুগটা হচ্ছে সংগঠনের যুগ। একটা জাতির উত্থানের পেছনে সংগঠনের ভূমিকা কতখানি?

● সংগঠন হচ্ছে একটা জাতির সবচেয়ে শক্তিশালী স্তম্ভ। এদের সংখ্যা যত বেশি হবে আর তারা স্নায়ু পেশিতে যত মজবুত হবে, জাতির শিরদাঁড়াও তত শক্ত হবে। একটা জাতির সংগঠনগুলো মজবুত না হলে এর উচ্চতর অঙ্গনগুলো এলিয়ে পড়ে। তাই একটা জাতিকে বড় হতে হলে তার সংগঠনগুলোর সংখ্যা ও যোগ্যতার অন্তহীন বিকাশ ঘটিয়ে যেতে হয়। একটা জাতির কিছু সংগঠন হয় খুবই বড় আকারের, যেমন : রাষ্ট্র। কিছু সংগঠন হয় মাঝারি, কোনোটা আবার ছোট, হয়ত খুবই ছোট আকারের। তবু এসব থাকতে হয়।

দিনকয়েক আগে একজন আমাকে এসে বললেন, আমি ছোট

আকারে একটা বিদ্যাসাগর সমিতি করতে চাই, একেবারেই অল্প কজন মানুষ নিয়ে। আমি বললাম, হতেই তো পারে। এ-ও কিন্তু একটা সংগঠন। কিছু সঙ্ঘবদ্ধ মানুষের একটা সংহতি। এরকম হাজার হাজার সংগঠন উন্নত দেশগুলোতে থাকে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদেরও চাই আজ অজস্র সংগঠন, যাদের একটা কল্যাণধর্মী বিশ্বাস আছে, একটা সুস্পষ্ট চেতনা আছে, সবকিছু মিলিয়ে একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও পরিকল্পনা আছে, যা সর্বোপরি অর্থপূর্ণ। কারণ আধখাঁচড়া সংগঠন দিয়ে জাতি বড় হয় না।

অবহেলায়, অনাদরে, কিছুটা শ্রমে, কিছুটা উদাসীনতায় এই যে অর্থহীন সব সংগঠন চারপাশে গড়ে উঠছে, ওসব দিয়ে আসলে কিছু হয় না শেষপর্যন্ত। শুধু হতাশা বাড়ে। যে সংগঠনের পেছনে অর্থাৎ অনেকের একত্রিত ও যূথবদ্ধ হওয়ার পেছনে একটা আগামীর অঙ্গীকার থাকে, যে সংগঠনের স্বপ্ন ও আদর্শের পেছনে মানুষের রক্ত থাকে, সে সংগঠনই একটা জাতির সম্পদ।

সংগঠন নিয়ে আপনার নিজের অভিজ্ঞতা কেমন?

● সংগঠন নিয়ে আমার অভিজ্ঞতা মোটামুটি ভালো। যেহেতু সংগঠন তৈরির কোনোরকম যোগ্যতা ছাড়া আমি তা করতে গিয়েছিলাম, তাই বহু জায়গায় জিভ পুড়িয়ে যেমন এগোতে হয়েছে, তেমনি শিখেছিও অনেক। আমার মনে হয়েছে, আমাদের যুগ সংগঠনের বেশ অনুকূল। একটা রাষ্ট্র ধীরে ধীরে সংহত হচ্ছে। এই মুহূর্তে অজস্র যোগ্য সংগঠন জন্ম না নিলে চলবে কেন?

কিন্তু এ-কালে সবচেয়ে বিপদগ্রস্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে আমাদের রাষ্ট্র সংগঠনটি। একটা জাতির সবচেয়ে বড় সংগঠন রাষ্ট্র। এই সংগঠনটি যদি কোনো কারণে দুর্বল থেকে যায় তাহলে অন্যান্য সংগঠনও কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমাদের সংগঠনগুলোর বিকাশের পথে রাষ্ট্রের নৈরাজ্য একটা বড় বাধা। রাষ্ট্রের ঐতিহ্য বা অভিজ্ঞতা না থাকায় রাষ্ট্রযন্ত্রটি নিয়ে আমরা আজও পুরো বেসামাল হয়ে রয়েছি।

রাষ্ট্রের 'রাষ্ট্রহীনতা' আমাদের সংগঠনগুলোকে অনেকখানি দুর্বল করে রেখেছে। না হলে এগুলো হয়ত আরও বহুদূর এগিয়ে যেত; সুসংহত হত। আজ এই জাতির মধ্যে একটা বিশাল উদ্যম কাজ করছে, অজস্র

সংগঠন বানিয়ে মানুষ একটা বড় জাতি তৈরি করতে চাচ্ছে, এই সময় রাষ্ট্র যদি শুধু জনগণের পাশে থাকত তাহলে আমরা অনেক শক্তিমান জাতিকেও ছাড়িয়ে যেতাম। রাষ্ট্রের ভেতরকার অনৈতিকতা, নৈরাজ্য আর দস্যুতা আমাদের সে স্বপ্নকে অনেকটাই ব্যর্থ করে দিয়েছে।

তবে এসব সত্ত্বেও বহু সংগঠন কিন্তু এর মধ্যেও যথেষ্ট শক্তির সঙ্গেই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। বলা যেতে পারে, রাজনীতি ছাড়াই জাতি এগিয়ে যাচ্ছে। এখন যদি শুধু রাজনীতিটা কোনোরকমে জনগণের পক্ষে এসে যায়, তাহলে সত্যিই হয়ত অসাধারণ কিছু করতে পারি আমরা। আমি মনে করি, আজ হোক কাল হোক এ ঘটবেই। কারণ জাতির সমস্ত সংগঠনগুলো ভালো চললে রাষ্ট্র এমনিতেই শক্ত হয়ে ওঠে।

২০০৫ সালে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত একটি মুক্ত আলোচনায় আপনার নিজস্ব অভিমত ও সমসাময়িক কালের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আপনি বলেছিলেন যে, আর বিশটা বছর আমাদের দরকার, জাতি হিসেবে একটা উন্নততর ও শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছানোর জন্য। এর এক দশক পর আপনার অভিজ্ঞতা জানতে চাই।

● সেদিন আমি যে স্বপ্নগুলো দেখেছিলাম, পরবর্তীতে রাজনীতিতে হয়ত তার উল্টো ধারাই আমরা লক্ষ করেছি। যার ফলে আমার সে সময়কার আশাবাদ হয়ত এরই মধ্যে কিছুটা হোঁচট খেয়েছে। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, সব শেষ হয়েছে। বরং তার মানে এই–জাতিগতভাবে একটা উন্নততর অবস্থানে পৌঁছানোর জন্য আমাদের সংগ্রাম ও আত্মোৎসর্গকে আরও কঠোরতর হওয়ার ডাক এসেছে। আমাদের দায়িত্ব বেড়ে গেছে। অন্ধকার সময়েই তো আলোর প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। এমনি দুর্দিনের ভেতর দিয়েই তো জাতি যোগ্যতর হয়।

নাসিরুদ্দিন হোজ্জার একটা কৌতুক আছে। সবাই জানেন সেটা। হোজ্জাকে একবার জিগ্যেস করা হয়েছিল, চাঁদ আমাদের বেশি উপকার করে, নাকি সূর্য? হোজ্জা বলেছিলেন, চাঁদ। প্রশ্ন করা হয়েছিল, কেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, সূর্য আমাদের আলো দেয় যখন আলো থাকে তখন, কিন্তু চাঁদ আমাদের আলো দেয় যখন আলো থাকে না তখন। তাই চাঁদই উত্তম।

গল্পটা হয়ত হাসির। কিন্তু এর ভেতরের কথাটা গুরুত্বপূর্ণ। তা হল আলোর মুহূর্তে আমাদের সংগ্রাম অতটা শক্তিশালী না হলেও চলে, কিন্তু অন্ধকার সময়ে তাকে কঠিনতর হতেই হয়। পথ কুসুমাস্তীর্ণ হলে আমরা হয়ত যোগ্য হব, কিন্তু দুঃখ-কণ্টকাকীর্ণ হলে আমরা উৎকৃষ্ট হব। আজকের এমন শূন্যতার ভেতর দিয়ে আমরা কিন্তু ধীরে ধীরে সে জায়গাতেই যাচ্ছি।

যে সোনার বাংলাকে আমরা আলসেমি আর হেলাফেলা করে পেয়ে যাব ভেবেছিলাম, ওটা পেতে আমাদের যে আরও স্বেদ, শ্রম আর রক্ত দিতে হবে–এ চেতনা তো আমাদের একটা উচ্চতর অর্জন। ব্যাপারটা কি আনন্দের নয়? এত রক্ত ও অশ্রুর মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা সোনার বাংলা এতে নিশ্চয়ই আরও বিশুদ্ধ আর খাঁটি হবে।

আপনাকে ধন্যবাদ স্যার।

- তোমাকেও ধন্যবাদ।

জন্মদিনের কথা

মানুষ যুদ্ধে যায় একসঙ্গে কিন্তু পালায় একা একা। যারা যুদ্ধে যাচ্ছে তাদের অবস্থা আর যারা ফিরে আসছে তাদের অবস্থা এক নয়। যেমন, তরুণদের জন্মদিন আর আমাদের জন্মদিন। ওদের জন্মদিন মানে বয়স বাড়া, আমাদের জন্মদিন মানে বয়স কমা। তবু জীবনে অনেক পথ হাঁটতে গিয়ে বুঝেছি, সব বয়সের মধ্যেই জীবনের সব বয়স আছে। যৌবনের মধ্যে যেমন রয়েছে বার্ধক্য, বার্ধক্যের মধ্যে তেমনি রয়েছে যৌবন। জীবনের পড়ন্ত বেলায় আমরা এখন জীবন নিয়ে যেমন ভাবি, মৃত্যু নিয়েও তেমনি।

অনেক আগে একটা উর্দু শের পড়েছিলাম। তার মর্মার্থ ছিল, 'সেটা কী বার্ধক্য যার মধ্যে যৌবন নেই, আর সেটা কী যৌবন যার মধ্যে বার্ধক্য নেই?' মানুষ আসলে এ দুইয়ের সংমিশ্রণ। মানুষ শুধু আশাবাদীও যেমন নয়, তেমনি পুরো নৈরাশ্যবাদীও নয়। অনেকসময় নৈরাশ্যও আশার জন্ম দেয়। আমাদের বড় বড় দুঃখ-বেদনাগুলো অনেকসময় বড় বড় উদ্যমে স্বপ্নে আমাদের উদ্বুদ্ধ করে। সেদিক থেকে জীবনে নৈরাশ্য বলে কিছু নেই। আশা নৈরাশ্য দুটোই দুভাবে আমাদের জীবনকে আশার স্বপ্নে জাগিয়ে তোলে।

মানুষ সাধারণত সামনের দিকেই যায়। কিন্তু সবসময় যায় না। মাঝেমধ্যে তাকে পেছন দিকেও যেতে হয়। এ তাকে যেতে হয় সামনে

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের ৭৭ তম জন্মবার্ষিকীতে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে আয়োজিত একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তব্য, ২৫ জুলাই ২০১৬

যাওয়াকে আরও শক্তিশালী করতে। আমরা যখন ঘুষি দিই, তখন হাত দিয়ে কি সোজা সামনের মানুষকে আঘাত করি? করি না, কেননা তাতে ঘুষিতে জোর হয় না। আমরা হাতটা প্রথমে কিছুটা পেছন দিকে নিয়ে আসি, তারপর সামনের দিকে সজোরে ছুড়ে দিই। তখনই তা ঘায়েল করার শক্তি অর্জন করে। সুতরাং জীবন পরস্পরবিরোধী, রহস্যময়। নৈরাশ্যকে আশা বানিয়ে, ব্যর্থতাকে শক্তিতে পরিণত করে আমাদের সামনে তা কেবলই এক উচ্চতর জীবনের দুয়ার খুলে দিচ্ছে।

আমার জন্মদিনের ছোট অনুষ্ঠানটা আয়োজিত হয়ে চলছে বহু বছর ধরে। অন্তত বছর পঁচিশেক তো হবেই। কে বা কারা এ শুরু করেছিল ঠিক মনে নেই। সেই যে শুরু, তারপর আর থামে নি। বছরের পর বছর ধরে আমাকে বৃদ্ধ থেকে অধিকতর বৃদ্ধে পরিণত করে এ এগিয়ে চলেছে। আমার করুণ অবস্থা দেখে মায়া করেও এ থামে না। এ কারণে প্রত্যেক বছর ঐ একই বিষয়ের ওপর আমাকেও একটি করে বক্তৃতা দিতে হয়। এক বিষয়ে কাঁহাতক আর বলা যায়? সেজন্য আমি ভাবছি, আজ একটা গল্প দিয়ে শুরু করব। গল্পটা খুবই সাধারণ। অনেকের জানাও থাকতে পারে।

এক ভদ্রলোক হেঁটে যাচ্ছেন, একটা খালের ধার ধরে। খালটা হাত তিরিশেক চওড়া। খালের ওপার দিয়ে আরেকজন হেঁটে যাচ্ছে। তার হাতে একটা বাঁশ। বাঁশের দৈর্ঘ্য হাত দশেক। লোকটা সেই বাঁশটা ডানে-বাঁয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাঁটছে।

তাকে এভাবে লাঠি ঘোরাতে দেখে এ পাড়ের লোকটা বলে উঠল, এই যে ভাই, বাঁশটা একটু আস্তে ঘুরাইয়েন, আমার গায়ে লাগতে পারে। ওদিকের লোকটা তো শুনে রেগে কাঁই। সে খেঁকিয়ে উঠল, বলল, আমার বাঁশ লম্বা ১০ হাত আর খাল চওড়া ৩০ হাত, কী করে এটা খাল পার হয়ে আপনার গায়ে লাগবে? বুজরুকির আর জায়গা পান না। যত্তসব! ধমক শুনে এপাশের লোকটা একগাল হেসে বলে উঠল, না, এই একটু গপসপ করি আর কী!

বাঙালির আছে শুধু এই গপসপ। গ্রামের হাট থেকে একটা ইলিশ কিনে রাস্তা দিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরুন। দেখবেন সে ইলিশ আর ইলিশ নেই। অন্তত পঞ্চাশজন হাত দিয়েছে ওর গায়ে। বেচারার গায়ে প্রত্যেকে

একটা করে চাপ দিয়ে জিগ্যেস করছে, কত দিয়ে কিনলেন ভাই? ওটা কেনার যত সাধ তার মনে ছিল আর কিনতে না পারার যত দুঃখ ছিল, সব একখানে করে ঐ চাপটা দিয়ে বলেছে নানা কথা : 'বেশ জিতেছেন তো! মাছওয়ালাকে একেবারে বসিয়ে দিয়েছেন।' কেউ আবার বলছে হয়ত কিছুটা অন্য কথা।

এভাবে এক দুই করে অন্তত ৫০ জনের আদর সোহাগ নিয়ে যখন মাছটা বাড়ি পৌঁছাবে তখন দেখবেন, ও আর যা-ই থাকুক মাছ নেই। থাকলেও খাওয়ার যোগ্য নেই।

যা-হোক, যত গপসপই করি না কেন, আমরা যে বয়সে এসে পৌঁছেছি সে বয়সে এলে জন্মদিন আর জীবনের পক্ষে থাকে না, মৃত্যুর দলে চলে যায়। জন্মদিন এলেই মাথা ফুঁড়ে মৃত্যুর ভাবনা উঠে দাঁড়ায়। এমনিতেও মৃত্যুচিন্তার মতো বিরক্তিকর ইভটিজার আর নেই। সে শিশু থেকে শুরু করে কিশোর যুবক বৃদ্ধ প্রৌঢ় সবাইকে টিজ করে, এমনকি মৃত্যুপথযাত্রীকেও। যেদিন জীবন সম্বন্ধে আমি প্রথম সজাগ হয়েছি, সেদিন থেকেই মৃত্যু উদ্যত বল্লম হাতে আমার পাশে পাশে হাঁটছে। কখন সে আমাকে গেঁথে ফেলবে কেউ তা জানে না।

তাই শুধু আমি নই, সবাই আক্রান্ত। বিশেষ করে আমার বয়সীরা। আমরা যখন আয়নায় তাকাই, হাসন রাজার মতো আমাদেরও মনে হয় : *আয়না দিয়া চাইয়া দেখি পাকনা চুল আমার*। জল্লাদ খুনি বা পাষণ্ড পৃথিবীতে এমন কে আছে যে মৃত্যুর দুঃখে ব্যথিত হয় নি? কেউ নেই। দেখুন জীবন মৃত্যু নিয়ে কী আক্ষেপ মাইকেলের!

জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায়রে, জীবন-নদে।

আর রবীন্দ্রনাথের কবিতা তো প্রায় মৃত্যুর স্তোত্রগানই। বসন্ত নিয়ে তাঁর কবিতা যত, মৃত্যুর কবিতা তিনি লিখেছেন তার চাইতেও বেশি। যেন জীবনের দেনা শোধ করেছেন দুজনকেই। আমি সবসময় ভেবেছি, বাংলা সাহিত্যে বসন্তের কবিতা যদি কারো লেখার কথা থাকে তিনি হবেন নজরুল। এমন যৌবনদীপ্ত, রক্তিম আর বেপরোয়া–যেন বসন্তের উড্ডীন

পতাকা। বসন্ত থাকলে থাকবে তাঁর কবিতাতে। কিন্তু আশ্চর্য, বসন্তের ব্যাপারে নজরুল আশ্চর্যরকমভাবে নির্বিকার। এ আছে রবীন্দ্রনাথের কবিতায়। তাঁর বিখ্যাত বসন্তের গান : *আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে ...।* বসন্ত আমার দরজায় জেগে বসে আছে। তো, সেই রবীন্দ্রনাথই আবার আরেক বিস্ময় : যে কবির বসন্ত নিয়ে এমন উজ্জীবন, তাঁরই মৃত্যুর কবিতার সংখ্যা কিন্তু বসন্তের কবিতার চাইতেও বেশি। প্রতি পদে তাঁর মৃত্যুর কথা! তাঁর কবিতা যেন মৃত্যুরই জয়গান।

রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে একবার লিখেছিলেন আমার মাথার ওপরে এমন নীল একটা আকাশ, কী বিশাল সবুজ একটা মাঠ আমার পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। কী করে এসব ছেড়ে পৃথিবী ছেড়ে আমি যাই ...। এরকম মৃত্যুবেদনার দ্বারা তিনি একেবারে আমুণ্ডুপদনখ আচ্ছন্ন ছিলেন আজীবন। ছিলেন, কেননা এই মৃত্যুবেদনা আসলে জীবন-প্রেমেরই অন্য নাম। হয়ত এজন্যই লিখতে পেরেছিলেন :

শ্যামলা বিপুলা এ ধরার পানে
চেয়ে দেখি আমি মুগ্ধ নয়ানে
সমস্ত প্রাণে কেন যে কে জানে
ভরে আসে আঁখিজল--
বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা,
বহু দিবসের সুখে দুখে আঁকা,
লক্ষ যুগের সংগীতে মাখা
সুন্দর ধরাতল।

পৃথিবী নামে তাঁর খুব বিখ্যাত কবিতার শেষ স্তবকে আছে :

হে উদাসীন পৃথিবী
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে
তোমার নির্মম পদপ্রান্তে
আজ রেখে যাই আমার প্রণতি।

তুমি সবাইকে ভুলছ পৃথিবী, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কিছুকেও। আমাকেও একদিন ভুলে যাবে। আমাকে সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়ার আগে তোমার নিষ্ঠুর পায়ে আমার প্রণতি জানিয়ে গেলাম। মানুষের মধ্যে মৃত্যুর দুঃখ আর

জীবন-বাসনা এতই ওতপ্রোত। আর জীবনানন্দ দাশ তো মৃত্যু আর বেদনার মধ্যেই পুরোটা কাল কাটিয়ে দিলেন।

আমরা মৃত্যুর আগে কি বুঝিতে চাই আর? জানি না কি আহা,
সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো এসে জাগে
ধূসর মৃত্যুর মুখ–

কিন্তু আমার মনে হয় এভাবে আমাদের ভাবা উচিত না। এ দৃষ্টি তো ইতিবাচক নয়। পৃথিবীর এই যে নদী, এই যে গাছ, এই বাগান, এই আকাশ, এই জীবজন্তু, এই যে সৌরজগৎ, গ্রহ-নক্ষত্র, বিশ্ব-মহাবিশ্ব যা-কিছু এ-যাবৎ জন্মেছে, যা-কিছু পৃথিবীতে আছে, সবই তো ধ্বংস হয়েছে, হবে। সুতরাং আমাদের কি মৃত্যুর দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে ব্যথিত হওয়া উচিত? এটা কি আমার ব্যক্তিগত বিষয়? তা তো না। এ তো সর্বজনীন ও সামগ্রিক বিষয়। গোটা মহাবিশ্বের বিষয়। কোটি কোটি মানুষের জীবনে এ ঘটেছে। সুতরাং সেখানে সবার মতো আমাদেরও তো মৃত্যুর এই বিপুল উৎসবে ঝাঁপ দিয়ে বুদ্‌বুদের মতো মিলিয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। আমাদের তো সেই আনন্দযাপনই কাম্য।

তবে এর পরেও একটা কথা থাকে। তা হচ্ছে আমরা সবাই একদিন হারিয়ে যাব এখান থেকে। আমাদের সামান্যতম চিহ্নও থাকবে না একদিন। সব সত্যি। কিন্তু আমরা যে একদিন পৃথিবীতে জন্মেছিলাম, এখানে বেঁচে ছিলাম, এরকম অবিশ্বাস্য আর অলোকসামান্য একটা পৃথিবীতে জীবন কাটিয়েছিলাম, থৈ থৈ আনন্দের এক সমুদ্রের মধ্যে যে পদ্মের মতো দোল খেয়েছিলাম, সেটা কি কিছুই না? মৃত্যুই শুধু সত্য?

একথা মনে হয় বলেই দুটো ব্যাপারই আমার মধ্যে হয়। আমার মৃত্যুবেদনাও হয়। আবার মৃত্যুকে ঝেঁটিয়ে তাড়ানোর একটা অদম্য ইচ্ছাও মনকে দখল করে। সেজন্য কখনও কখনও গলায় একটু দুঃখের সুর বেজে ওঠে। এটা আসলে দুঃখ নয়। এটা সেই ঘুষির মতো, হাতটা একবার পেছনে টেনে এনে শক্তি সঞ্চয় করে মুষ্ঠির জোর বাড়িয়ে সামনে ছুড়ে দেয়া।

মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্যে একটা খুব সুন্দর কথা আছে। রাবণের বীর সন্তান বীরবাহু যুদ্ধে নিহত হয়েছে। একজন ভগ্নদূত এসে

খবরটা তাঁকে দিয়েছে। তিনি কাঁদছেন। তাঁর *ঝরঝর ঝরে অবিরল অশ্রুধারা*। রাবণ ধৈর্যশীল মানুষ, পরাক্রান্ত রাজা, তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিল তাঁর মন্ত্রী–সারণ। সে ব্যাপারটা ধরিয়ে দিল, বলল, রাজা আপনি মহান, এই বিশাল রাজ্যের ধারক। পুত্রশোকে অশ্রুবিসর্জন কি আপনার সাজে? বজ্রাঘাতে যদি পর্বতের শৃঙ্গ উড়েও যায়, তাতে কি পৃথিবী অস্থির হয়? পর্বতের শৃঙ্গরূপ আপনার বীরপুত্র নিহত। কিন্তু তাতে আপনার কি বিচলিত হওয়া সাজে! শুনে রাবণ বললেন, *সবই বুঝি। যা কহিলে সত্য হে সারণ, তবু জেনেশুনে প্রাণ কাঁদে অবোধ*। সব অর্থহীন জানি, কিন্তু জেনেশুনেও মন যে কাঁদে, সেজন্যই তো আমরা মানুষ। হয়ত আমার গলায় বেদনার সুর ঐ কারণেই। আমি মানুষ বলেই।

একটা ছোট্ট গল্প বলি। গল্পটা এক রোমান কাহিনীকাব্যের। কবি ওভিদের লেখা। গল্পটা এরকম : এক মেয়ে ছিল, অপূর্ব সুন্দরী। নাম সিবিল্লা। অনুপম সুন্দরী সে। তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গ্রীক দেবতা অ্যাপোলো তার কাছে প্রেম নিবেদন করলেন। সিবিল্লা বলল, তোমার প্রেম আমি গ্রহণ করতে পারি কিন্তু এক শর্তে। আমাকে একটা বর দিতে হবে। বরটা হল, এই যে সামনে বালুর বিশাল ঢিবিটা আছে, এই ঢিবিতে যত বালু আছে, আমি যেন তত বছর বাঁচি। এখন কী করেন বেচারা অ্যাপোলো? প্রেমে পড়েছেন যে! কথায় আছে–কিনতে পাগল বেঁচতে ছাগল। তেমনি প্রেমে পাগল অ্যাপোলো বললেন, ঠিক আছে এ বরই তোমাকে দিলাম। বর পেয়েই সিবিল্লার মনে হল, সে একটা বিরাট ভুল করে ফেলেছে।

চির জীবনের বর সে চেয়েছে কিন্তু চির যৌবনের বর তো চায় নি। কাজেই সে মরল না। আগের মতোই তার বয়স বাড়তে লাগল। সে যুবতী থেকে একসময় প্রৌঢ়া হল। প্রৌঢ়া থেকে বৃদ্ধা। দেখতে দেখতে একশ বছর পার হল। একসময় দেড়শ বছর, দুইশ বছর পার হল। সে একটা কদর্য কাদার পিণ্ডে পরিণত হল। তখনও সেই কদাকার পিণ্ড থেকে মানুষ সিবিল্লার জীর্ণ কণ্ঠে তার যৌবনদিনের অহংকারী কণ্ঠ শুনতে পেত। তারা শুনত সে বলছে : একদিন আমি এমন সুন্দরী ছিলাম যে, অ্যাপোলো আমার কাছে প্রেম নিবেদন করেছিলেন।

সুতরাং যৌবন ভালো। কিন্তু জীবন যেন ওই বালুর ঢিবির সমান না

হয়। যেন হাজার বছর আমরা না বাঁচি। জীবন ততদিনই জীবন যতদিন তাতে যৌবন আছে। তারপরে জীবনের কী অর্থ?

আজকেই কার কাছে যেন শুনলাম এক লেখক রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন বেঁচে ছিলেন।' শুনে অবাক হলাম, এ আবার কী কথা? মানুষ তো সারা জীবনই বাঁচে, এর চেয়ে কম বাঁচে নাকি? আসলে বক্তব্যটার সারকথা হল, তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন পুরোপুরিই বেঁচে ছিলেন। অর্থাৎ যৌবনদীপ্ত আর কর্মমুখর ছিলেন। আমরা সাধারণত মৃত্যুর বহু আগেই মারা যাই। রবীন্দ্রনাথ সেভাবে মারা যান নি। রবীন্দ্রনাথকে কিন্তু অল্প বয়সের ছবির চাইতে বেশি বয়সের ছবিতে সুন্দর লাগে। তার কারণও এটি। তাঁর বয়স বেড়েছে কিন্তু যৌবন তাঁর মধ্যে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। যৌবন আর বার্ধক্য যদি একসঙ্গে হয়, তার চাইতে শক্তিশালী জিনিস পৃথিবীতে খুব কমই আছে।

আর একটা কথা বলি। সুকুমার রায় মাত্র ৩৬ বছরে মারা গিয়েছিলেন। এই রকম প্রতিভাবান মানুষের মাত্র ৩৬ বছর বয়সে মারা যাওয়া সত্যি দুঃখের! কিন্তু আশ্চর্য, সুকুমার রায়ের কবিতায় আমি কোথাও বেদনার কথা পাই নি। হয়ত তাঁর কবিতার হাসির হুল্লোড়ের মধ্যে মৃত্যুর জায়গা হয় নি। একইভাবে পাই নি নজরুলের কবিতায়। থাকতে পারে, হয়ত আমার চোখে পড়ে নি। কিন্তু একটা জায়গায় সুকুমার রায় মৃত্যুর কথা বলেছেন। তাঁর একেবারে শেষের দিকের একটা কবিতায়। তাঁর মৃত্যুর কাছাকাছি সময়ে। উনি লিখছেন, আদিম রাতের চন্দ্রালোকিত শীতলতা আমাকে ধীরে ধীরে অধিকার করছে। দেখলাম জীবনটা হল একটা *তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম* ছাড়া কিছু নয়। তারপর বলছেন, *ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর, গানের পালা সাঙ্গ মোর*। জীবনটা কি তাহলে তাঁর কাছে? তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম। এখানেও কিন্তু ব্যঙ্গ করতে তিনি ছাড়ছেন না।

আমি কিন্তু একথার সঙ্গে একমত নই। জীবনে 'জীবন' একদিন থাকে না বলে একে আমি ঘোড়ার ডিম বলব? কিন্তু মৃত্যু আছে বলেই না জীবনকে আমরা এইভাবে ভালোবাসি। মৃত্যু আছে বলেই না আমরা কবিতা লিখি। গান গাই। ছবি আঁকি। তাজমহল তৈরি করি। মৃত্যু যদি

না থাকত অর্থাৎ ঐ ঘোড়ার ডিমটা যদি না থাকত, তাহলে আমরা তো অন্য যে-কোনো জীবের মতো আরেকটা জীব হয়ে যেতাম। তাই আমি মনে করি, জীবনকে সত্যিকার অর্থ দেওয়ার জন্য 'জীবন' যে-রকম দরকার, 'মৃত্যু'ও সে-রকমই দরকার।

সবশেষে একটা ছোট্ট গল্প বলে শেষ করব। জাপানে এক রকমের সুস্বাদু খাবার আছে। নাম সুশি। তাতে প্রথমে কিছু মাছের বাচ্চা কাঁচা অবস্থায় ফালি ফালি করে কাটা হয়। তারপরে একটা সস্ দিয়ে সেগুলো খাওয়া হয়। এটা একটা পৃথিবী বিখ্যাত খাবার। কিন্তু যেসব মাছ দিয়ে সুশি তৈরি হয়, সে মাছ সমুদ্র থেকে ধরে পাত্রে করে নিয়ে আসতে যে সময় লাগে, তার মধ্যে ওই মাছের বাচ্চাগুলোর একটা বড় অংশ মরে যায়। আর মরে গেলে সুশির স্বাদও যায় কমে। এখন এদের বাঁচিয়ে রাখার উপায় কী?

এই নিয়ে শুরু হল গবেষণা। বিস্তর চিন্তাভাবনার পর একটা বুদ্ধি বের হল : যেসব পানিভর্তি বিশাল বিশাল পাত্রে করে ঐ মাছের বাচ্চাগুলোকে আনা হচ্ছে, ওগুলোতে কিছু কিছু হাঙরের বাচ্চা ছেড়ে দাও। এতে দেখা গেল, হাঙরের বাচ্চাগুলো ওদের খাওয়ার জন্য সারা পাত্রজুড়ে যেমন দৌড়াচ্ছে, তেমনি সুশি মাছগুলোও নিজেদের বাঁচানোর জন্য প্রাণভয়ে দৌড়ে চলেছে। দৌড়াতে দৌড়াতে একসময় ভুলেই যাচ্ছে যে, ওদের আসলে মারা যাওয়ার কথা ছিল!

আমার জীবনের ভেতরে আমিও ওরকম এক দঙ্গল হাঙরের বাচ্চা ছেড়ে দিয়েছি। সেই হাঙরের বাচ্চাগুলোর নাম হল কাজ। আমি কাজ বাড়িয়ে দিয়েছি। এমনভাবে বাড়িয়েছি যাতে ও ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা আমাকে দখল করতে না পারে।

আমি সবসময় ছাত্রদের একটা কথা বলি—*লেখাপড়া করে যেই, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই*। বলি, কথাটা সবাই জানে। কিন্তু ভালো ছাত্রেরা জানে কবে? বছরের প্রথম দিনটিতেই। তাই সারা বছর প্রাণপণে পড়াশোনা করে পরীক্ষায় ভালো ফল হাতিয়ে নেয়। খারাপ ছাত্রেরাও কথাটা জানে। কবে? যেদিন পরীক্ষাটা শেষ হয় সেদিন। তাই সেদিন কপাল চাপড়ে বলতে থাকে, প্রথমদিন যদি বুঝতাম তবে পরীক্ষার ফল হয়ত এভাবে খারাপ হত না।

তাই সময় থাকতে থাকতে সবাইকে বলি, দেরি করো না। জীবনের মধ্যে ওই হাঙরের বাচ্চাগুলোকে ছেড়ে দাও। শত শত কাজ তোমাকে অনুক্ষণ তাড়া করুক। দেখবে মৃত্যুর কথা ভুলে গেছ। দেখবে তুমি দাঁড়িয়ে আছ যৌবনে, শক্তিতে, রক্তিম প্রাচুর্যের ভেতর। অর্থাৎ ইতিবাচকতায়। ঐশ্বর্যের জগতে। (সবার হাততালি)।

কী, খুশি তো? না, আমি অন্যদের জিগ্যেস করছি না। (হাত ইশারায় দেখিয়ে) ওই যে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের যারা বসে আছেন, ওদের জিগ্যেস করছি। ইতিবাচকতা বলাতে খুশি তো? খুশি? বেশ!

ধন্যবাদ।

বহুমুখিতা ও স্বপ্নচারিতায় অনন্য আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ (জন্ম : ১৯৪০ সালে, কোলকাতায়)। জাতীয় মনন নির্মাণ ও কিশোর–তরুণসহ বিপুল জনগোষ্ঠীর মানসিক উৎকর্ষ অর্জনের অক্লান্ত ব্রতে তিনি নিবেদিতপ্রাণ। সদাহাস্যময়, বাগ্মী, কবিতা ও দর্শনপ্রাণিত এই আশাবাদী মানুষটি নিজে স্বপ্ন দেখেন এবং অন্যকে দেখান।

শিক্ষক হিশেবে তাঁর খ্যাতি কিংবদন্তীতুল্য। ষাটের দশকে দেশে নতুন ধারার সাহিত্য আন্দোলনে তিনি দিয়েছেন বলিষ্ঠ ও সফল নেতৃত্ব। বাংলাদেশ টেলিভিশনের শুরু থেকেই রুচিমান ও মনস্বী অনুষ্ঠান নির্মাণের মাধ্যমে টিভি–অনুষ্ঠানমালায় নতুন মাত্রা যুক্ত করেন তিনি।

রুচিঋদ্ধ পঠন–পাঠন ও মননশীল সংস্কৃতি চর্চার অনবদ্য প্রতিষ্ঠান বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। এর প্রতিষ্ঠাতা হিশেবে অগণিত জ্ঞানার্থীকে বর্তমান বিশ্বের বৃহত্তম বইপড়া কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন আলোর ফেরিওয়ালা আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। বহুমাত্রিক লেখক হিশেবেও তিনি পাঠকপ্রিয়। তাঁর গ্রন্থসংখ্যা এ–পর্যন্ত ৫৭। যার মধ্যে রয়েছে কবিতা, প্রবন্ধ, ছোটগল্প, নাটক, জর্নাল, জীবনীমূলক রচনা, শিশু–কিশোর রচনা, ভ্রমণ–সাহিত্য, সম্পাদিত গ্রন্থ ইত্যাদি।

সাংগঠনিক নৈপুণ্যে তিনি বরাবরই অসামান্য। অফুরান তাঁর জীবনীশক্তি, অদম্য তাঁর কর্মপ্রাণতা। ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে চলেছেন তিনি অসীম দৃঢ়তায়।

স্বীকৃতি, পুরস্কার, সম্মাননা তিনি পেয়েছেন অনেক। যার মধ্যে জাতীয় টেলিভিশন পুরস্কার, এশিয়ার নোবেল হিশেবে পরিচিত র‍্যামন ম্যাগসাইসাই, একুশে পদক, বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ পদক, বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, ডা. ইব্রাহিম স্মৃতি স্বর্ণপদক উল্লেখযোগ্য।

quantummethod.org.bd

ISBN 978-984-34-2351-1